বক্তৃতা।

অর্থাৎ

বঙ্গের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা

কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজকের

বক্তৃতার সার সংগ্রহ।

শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

বারাণসী।

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

শঃ ১৮১৩।

২য় খণ্ড।

মূল্য ।০ আট আনা।

প্রবৃত্তিমার্গ।

নানাদেশের নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার যখন কোন মহামেলায় পুঞ্জীকৃত ও সুসজ্জিত হয়, তখন সেই উত্তম ২ পদার্থরাশি দেখিয়া দরিদ্রের চিত্ত লোভে বিমুগ্ধ হয়, মহামেলার সমস্ত মনোরম সামগ্রী একটি ২ করিয়া কিনিতে তাহার সাধ যায়। সুবিশাল মহামেলার সুন্দর বিপণিতে সুসজ্জিত পণ্য রাশি সমস্তই আত্মসাৎ করিতে তাহার প্রাণ যেন আকুলি বিকুলি করিতে থাকে। সেই রূপ এই সংসারক্ষেত্রে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ীর অদ্ভুত মহামেলায় আমাদের মত লোভে ক্ষোভে অভাবে অভিভূত দীন দরিদ্র জীব গণ সমবেত। মহামায়ার মহামেলার এ অনন্ত ভাণ্ডারে প্রাণ মনোমোহন বিচিত্র পণ্যরাশি থরে ২ সাজান রহিয়াছে। তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ এই মূল্যবান সামগ্রী সম্ভারের দিব্য চমকে আমরা আকৃষ্ট। এ উত্তমোত্তম সমস্ত পদার্থই লইবার

জন্য প্রাণ যেন লালায়িত। আমরা উত্তম বস্তু চাই বটে, কিন্তু উত্তম বস্তু চেনা বড় শক্ত। সময় বিশেষে অবস্থা-বিশেষে স্থান বিশেষে লোক বিশেষের যাহা উত্তম, অন্যের পক্ষে তাহাই হয়তো মন্দ বোধ হয়, শৈশবে যাহা ভাল লাগে, যৌবনে তাহা হেয়, আবার যৌবনে যাহা হেয় তাহাই বার্দ্ধক্যে আবার উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। হয় তো তোমার অবস্থাদির অনুকূল হওয়ায় তোমার পক্ষে যাহা ভাল, তাহাই আমার অবস্থাদির প্রতিকূল হওয়ায় আমার পক্ষে মন্দ। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা নির্বিশেষে যাহা উত্তম তাহা চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। অনেক সময় আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া বুঝি, এবং ভালকে মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করি। অনাদি কাল হইতে এই ভ্রান্তি রূপ অবিদ্যা বেশের বশীভূত হইয়া জীব এ মহামেলা ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই সুবিস্তীর্ণ সংসার-মহামেলায় জীবের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই অসীম

কার্য্যস্তরের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের অপরিহার্য্য নিজ কর্ত্তব্য তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। দোকানে থরে ২ সাজান জিনিষের মধ্যে যেটি আমাদের মনোমত ও অতি প্রয়োজনীয় উত্তম জিনিষ, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে।—আমাদের পরমায়ু অল্প, আমাদের শক্তি সামর্থ্য নিতান্তই ক্ষীণ, সুতরাং আমরা দীন দরিদ্র পথের কাঙ্গাল। অনন্ত শাস্ত্রের বিশালগর্ভে অনন্ত মূল্যবান তত্ত্ব রূপ পণ্য রাশি নিহিত আছে। সে সমস্তই ক্রয় করিবার সাধ্য আমাদের নাই। সুতরাং সে সমস্তের দিকে লোভলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? যাহা আমাদের নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যাহা আমাদের নিজের উপকারে আসিতে পারে, তাহাই আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বাছিয়া লইবার উপায় কি? আমাদের স্বেচ্ছা আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যায়, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করে, তদনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই কি ঠিক? কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে?

আমাদের প্রবৃত্তি যাহা চায়, তাহাই যে আমাদের পক্ষে উত্তম, তাহাই যে আমাদের হিতকারী, তাহা কে বলিবে? অনেক সময় স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সুপথ ভাবিয়া কুপথে গিয়া পড়ি। প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক সময়েই কু সু বিচার করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং স্বেচ্ছাগত 'উত্তম' বস্তু নির্ব্বাচন করা বড়ই দুষ্কর। কিন্তু জগতের জীব স্বেচ্ছাভিগত উত্তম বস্তু পাইবার জন্যই লালায়িত। প্রবৃত্তি-রাগরঞ্জিত উত্তম পদার্থের প্রত্যাশায় জীব আকুলিত। যাহা প্রকৃতির অনুকূল, অথচ "উত্তম", তাহাই পাইবার জন্য জীবের অন্তরাত্মা পিপাসু। বৈদান্তিক প্রবৃত্তির মস্তকে পদাঘাত করেন, আমাদের মত অনধিকারী জীব কিন্তু প্রবৃত্তির দাস। সুতরাং প্রবৃত্তিকে আমরা ছাড়িতে পারিব না। যে প্রবৃত্তি নিজ প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহা অবশ্যই পরিহার্য্য। কিন্তু যে প্রবৃত্তি স্বভাবগুণে চালিত হইয়া প্রকৃতির চারু চরণ চুম্বন করিতে পারে, তাহা কখনই জীবকে কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট করে না। প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ

দূষিত পদার্থ নহে। এ পাপজ্জনাময় সংসারে পড়িয়াই ময়লা-মাটিমাখা হইয়া প্রবৃত্তি দূষিত বা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রআজ্ঞা পরিপালনরূপ পবিত্র গঙ্গাজলে তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে হইবে। তাহার সাংসারিক কালিঝুলি মাখা মূর্ত্তি পরিমার্জ্জিত করিয়া সুঠাম সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। প্রবৃত্তির গতি অবিদ্যা নিবৃত্তির মুখ হইতে ফিরাইয়া প্রকৃতির সম্মুখীন করিয়া লইতে হইবে। পরিমার্জ্জিত প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রসূতি।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, প্রবৃত্তিকে নিজ ঈপ্সিত পথে যাইতে না দিয়া তাহাকে সংযত—নিয়মিত করিলে তাহাতে সুখ কি? প্রবৃত্তির গতি সঙ্কুচিত করিলে তাহাতে যে অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠে। এ সন্দেহ নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পঞ্চম বর্ষীয় বালক রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতে চায়। পিতা তাহার দৌড়ান-প্রবৃত্তি সংযত করিয়া তাহাকে ধীরগমন শিক্ষা দিলেন। এইরূপ প্রবৃত্তির সংযমনে বালকের আপাততঃ

একটু অতৃপ্তি জন্মিল বটে, কিন্তু তাহার পরিণামফল যে মঙ্গলময় তাহা বালক এখন বুঝিল না, কিন্তু পরে বুঝিবে। সুতরাং প্রবৃত্তির সংযমনে আপাততঃ একটু দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম-ফল সুখময়। স্বেচ্ছাচারী আপনার ক্রিয়াকেই ভাল বাসে, বুদ্ধিমান্‌গণ ক্রিয়ার পরিণাম-ফলের দিকে তাকাইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। অপরিণামদর্শী বিমূঢ়চেতাগণ ক্রিয়ার ফলসন্ধানে অসমর্থ হয়, তাই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারেনা-চায়ও না।

আমাদের যাহা মনোরঞ্জনকর—আশুসুখকর, প্রবৃত্তি আমাদিগকে সেইদিকে লইয়া যাইতে চায়, কিন্তু তাহাতে পরম কল্যাণলাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, যাহাতে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয় প্রবৃত্তিকে সেই পথের পথিক করা উচিত। মহামেলায় গ্রহণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত থাকে। চক্‌চকে খেলেনা দেখিয়া বালকের মন ভুলিয়া যায়। সুতরাং তাহা লইবার জন্য বালক

চঞ্চল হয়। কেননা অপরিপক্ক বালবুদ্ধি জন্য তাই তাহার ভাল লাগে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বহুদর্শী ব্যক্তি খেলেনার চমকে ভুলেন না, তিনি তেমন জিনিষ বাছিয়া গ্রহণ করেন, যাহা তাঁহার প্রয়োজনীয়, যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, যাহা তাঁহার নিজের উপকারে আসিতে পারে। এ সংসার-মহামেলায় যিনি সুচতুর, তিনি টুকটুকে মাকালফলের সৌন্দর্য্যে ভুলেন না, তিনি তেমন জিনিষ প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া লন, যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়। সুতরাং প্রবৃত্তির সকল কথাই শুনিলে চলিবে না। স্থলবিশেষে প্রবৃত্তির বল্গা সংযত করিতে হইবে। গুরুজনের নির্দেশানুসারে, শাস্ত্রের ইঙ্গিতানুসারে প্রবৃত্তিকে সুগঠিত ও সুপথে চালিত করিতে হইবে। কিন্তু অভিমানে পরিপূর্ণ জীব নিজপ্রবৃত্তিকে এতই অভ্রান্ত মনে করেন, যে তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া স্বেচ্ছার স্বাধীনতাই দিতে চাহেন। অভিমানই যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার পদতলে শাস্ত্র-আজ্ঞা, গুরুবাক্য, সাধুদিগের সদুপদেশ রাশি বিমর্দ্দিত হইবে, তাহাতে

আর আশ্চর্য্য কি ? যাহার দোকানে যে বস্তু অধিক, সে তাহাই সম্মুখে সাজাইয়া রাখে। ক্রেতাকে তাহাই দিয়া সে পরিতৃপ্ত করিতে চায়। সেই রূপ যাহার সাধুতা বিন্দু মাত্র নাই, অভিমানই অধিক; সে নিজের দোকানে অভিমানের পশারাই সাজাইয়া রাখে। সুতরাং তাহার কাছে অভিমান ছাড়া আর কি পাওয়া যাইতে পারে ? যে যে দরের লোক, সে সেই রূপ দরের লোকের মণ্ডলীতেই ঘুরিয়া থাকে। যাহার মর্য্যাদা নীচ, সে নীচ শ্রেণীর মণ্ডলীতেই যাইতে সুখ বোধ করে। অভিমানের সঙ্কীর্ণ মর্য্যাদা যাহার সম্বল, তাহার নিরভিমান অনন্ত মর্য্যাদার আধার পর ব্রহ্মের দিকে কেমন করিয়া গতি হইতে পারে ? তাই বলিতেছি, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র আজ্ঞা অনুসারে প্রবৃত্তিকে সংযত—সুমার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। ঘরকন্নার কোন সামান্য জিনিস ব্যবহার করিতে হইলে আমরা তাহা ধৌত করিয়া—মার্জ্জিত করিয়া লই। আর অনন্ত ব্রহ্মের উচ্চ দরবারে যাইবার জন্য

যে প্রবৃত্তিকে আমরা ব্যবহার করিতে চাই, তাহাকে ধৌত করিয়া লইতে হইবে না, এ কোন কথা ? স্বভাব-সূত্রে প্রবৃত্তিকে আমরা পাইয়াছি, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, ইহা ঠিক । কিন্তু তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া নিজ জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য সাধনোপযোগিনী করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে । যাহা আমাদের স্বাভাবিক, তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব । আমরা স্বভাবসূত্রে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছি । স্ফীতালোকে উন্মুক্ত চক্ষুর সম্মুখে পদার্থ অর্পিলেই দৃষ্টিশক্তির তাহা গোচর হইবেই হইবে । শত চেষ্টা করিলেও এ দৃষ্টিশক্তির গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না । সেই রূপ স্বভাবসূত্রে কতকগুলি সংস্কার আমরা স্বস্ব কর্ম্মসূত্রে পিতা মাতার কাছ হইতে ও অন্যান্য নানা কারণে পাইয়াছি । স্নেহ, মায়া মমতা, প্রীতি প্রবৃত্তি আদি সমস্তই পাইয়াছি । এই স্বাভাবিক বৃত্তি গুলিকে একবারেই পরিহার করিব কেমন করিয়া ? স্বভাবসূত্রে শরীরের শ্যামবর্ণ লইয়া যে

জন্মিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহা একবারে উঠাইতে পারা যায় কি ? উঠাইতে পারা যায় না, কিন্তু মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই রূপ স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারকে শত শিক্ষা দিলেও উঠাইতে পারা যাইবে না, কিন্তু শিক্ষার গুণে মার্জ্জিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৈদান্তিক প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ নিকৃষ্ট আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমরা কিন্তু তাহা চাহি না। সে মাটি— যে কর্দ্দমকে তোমরা আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাও, যিনি উপাসক, তিনি সেই মাটিতে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের সাধের উপাস্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংস্কার—যে প্রবৃত্তিকে তোমরা আবর্জ্জনা—সংসারবন্ধনের হেতুভূত বলিয়া ত্যাগ করিতে চাও, আমরা তাহাকে শিবলিঙ্গের ন্যায় সদাকারাকরিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে চাই—সংসার বন্ধন মোচন করিতে চাই। সুবর্ণ যখন পিণ্ডাকারে থাকে, তখন তাহার

ব্যবহার হয় না সত্য, কিন্তু তাহা যখন স্বর্ণকারের হাতে পড়ে, তখন অলঙ্কার রূপে পরিণত হইয়া সে সুবর্ণ বরণীয় কান্তিময় দিব্যমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়। সেই রূপ ভগবৎ-প্রসাদে এই মনুষ্যদেহে অনেক সুবর্ণ লইয়া আমরা জন্মিয়াছি। প্রকৃত শিল্পনিপুণ স্বর্ণকারের সাহায্যে সে সুবর্ণে বিচিত্র অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে। সে অলঙ্কাররাশি অঞ্জলি পুরিয়া জগন্মাতার অলক্তকুঙ্কুমাম্বরঞ্জিত চরণাম্বুজে যে দিন উপহার দিব, সেই দিনই সাধ মিটিবে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নিরাশ করিয়া নিত্য নির্ম্মল নিকেতনে তোমার নিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

৮ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবৃত্তিকে মূল প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। জীবের ক্ষুদ্র প্রকৃতি নীরবে মূল প্রকৃতির দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণ ভাবে যাহা চায়, সেই প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিতে থাকিবে। মূল প্রকৃতিকে

উন্মুখ করিয়া প্রবৃত্তি যাহাতে তদভিমুখীন হয়, সেই রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু প্রথমে ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন কাঁদিয়া উঠে, সে তখন বুঝিতে পারেনা কিসের জন্য সে কাঁদিতেছে, তাহার কি ক্লেশ হইতেছে। কি পাইলে তাহার কান্না নিবৃত্ত হইতে পারে, সে তাহা জানে না। তাহার শারীর প্রকৃতি কি অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেছে না। অপরকে মুখ ফুটিয়াও বুঝাইতে পারিতেছে না। তাহার প্রাণ কিসের জন্য ব্যাকুল সে তাহা না বলিতে পারিলেও তাহার ক্ষুধাবিহ্বল শারীর প্রকৃতি নীরব ভাষায় তাহা বলিয়া দিতেছে। সেই প্রকৃতির জননী মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ বালকের মাতা শারীর প্রকৃতির সেই গুহ্য মর্ম্মগাথা বুঝিতে পারেন। তাই তিনি স্তন লইয়া বালকের মুখে দেন, সে স্তন চুষিয়া দুগ্ধ পান করিবার জন্য শিশুর প্রবৃত্তি স্বত এব ফুটিয়া উঠে। শিশুর ক্ষুধাবিশুষ্ক শারীর প্রকৃতি দুগ্ধধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া প্রফুল্ল হয়। শিশুর শারীর-

প্রকৃতির ক্ষুধারূপ তাৎকালিক অভাব যেমন মাতার স্তন্যপানে পূর্ণ হয়, সেই রূপ জীবপ্রকৃতির অন্তস্তলে যে অভাবরেখা—যে প্রাণের মজ্জাগত ক্ষুধা—যে অতৃপ্তি অনাদিকাল হইতে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত সূক্ষ্মরূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সে অভাব—সে অতৃপ্তি জগন্মাতা মূলপ্রকৃতি মা অন্নপূর্ণার স্তন্যপানে যে দিন পরিতৃপ্ত হইবে, সেই দিনই জীবের কান্না থামিবে, কোলাহল—কলরব বন্ধ হইবে, ইন্দ্রিয়-চাপল্য, মনশ্চাঞ্চল্য স্তম্ভিত হইয়া আসিবে, হৃদয় সুশীতল হইবে, দুঃখ দারিদ্র্য বিনিবৃত্ত হইয়া যাইবে। মায়ের কোলে মায়ের ছেলে চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িবে। সচেতনে শান্তিসুধাপানে অচেতন হইয়া থাকিবে। শিশুর শারীরপ্রকৃতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া যেমন কাঁদিয়া উঠে, সেই রূপ জীবপ্রকৃতি গুরুদত্ত উপদেশে নিজের চিরদিনের মজ্জাগত অভাব—প্রাণের মর্ম্মগত ক্ষুধা জাগ্রত করিয়া মূলপ্রকৃতি জগন্মাতা অন্ন-

পূর্ণার চরণতলে মাথা রাখিয়া যে দিন কাঁদিয়া উঠিবে, সেই দিন দুগ্ধামপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বীহস্তা রাজরাজেশ্বরীর মায়ের দুগ্ধামৃত ধারায় জীবের আকাঙ্ক্ষা—প্রবৃত্তিপ্রবাহ চরিতার্থ হইবে—চিরদিনের সাধ মিটিবে। অনন্তপ্রকৃতিরূপিণী মা ক্ষুদ্র জীবপ্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য—প্রকৃতির অনুগামিনী প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদাইত উন্মুখী হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি মামুখী না হইয়া—প্রকৃতির অভিমুখী না হইয়া চিরদিনই বিকৃতির পথে চালিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রের আদেশে গুরুর নির্দেশে প্রবৃত্তিকে প্রকৃতির সম্মুখীন করিতে হইবে, প্রবৃত্তির স্রোত উল্‌টাইয়া দিতে হইবে। মানবের ব্যক্তিগত প্রকৃতির গুহ্যতত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন, কোন্ উপাদানে—কোন্ গুণের কি রূপ অংশে কাহার প্রকৃতি গঠিত, প্রকৃতি কোন্ দোষে উহা অনাদ্যা প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইতে পারিতেছে না, ও কোন্ ঔষধেই বা এই রোগ নিবৃত্ত হইবে, এতাবৎ

যিনি সম্যগ্‌ রূপে অবগত আছেন, প্রকৃতিকে তাঁহারই কথানুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রবৃত্তি আর বন্ধনের হেতু হইবে না।

কেহ ২ আশঙ্কা করিতে পারেন, আমাদের প্রবৃত্তি কোন্‌ পথে চালিত হইলে কি রূপ সুখ লাভ হয়, আমরা চিন্তা করিয়া তাহা বুঝিতে পারি। তাহাতে গুরুউপদেশ, শাস্ত্রকর্ত্তা ব্যাসবশিষ্ঠের উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন কি! তাঁহারা হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ, আমরাও মানুষ, তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি বিচারশক্তি চিন্তাশক্তি ছিল, আমাদেরও আছে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন কি বিভিন্নতা আছে, যে তাঁহারা সকল বিষয়ে মঙ্গলামঙ্গল আমাদের অপেক্ষা বেশী বুঝিতেন। এমন কি পার্থক্য আছে যে তাঁহাদের কথা মানিতেই হইবে। এ আশঙ্কার আর উত্তর দিব কি? জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণকে আমাদের সমান-স্তরে যিনি আনিতে চাহেন, তিনি নিতান্তই অজ্ঞ ও বাতুল। ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ বিস্তর।

পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি। একটা লৌহনির্ম্মিত সূচিকে চুম্বকে ঘর্ষণ করিলে তাহাতেও আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার হয়। সে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই চুম্বকত্বপ্রাপ্ত (Magnetized) সূচিকে অপর একটা লৌহনির্ম্মিত সাধারণ সূচির নিকট রাখিয়া দেখিলে দুইটিকেই সমান বলিয়া বোধ হয়। কেননা দুইটির আকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু পরীক্ষার নিকষে কসিলে দুইটির পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। অপর একটা লৌহনির্ম্মিত সূচিকে সেই দুইটির কাছে আন দেখি, দেখিবে, সে ছুঁচটি সেই আকর্ষণীশক্তিসম্পন্ন সূচির দিকেই দৌড়িয়া যাইবে কেননা সে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তখন অপর ছুঁচটির স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন বুঝিতে পারা যায় উভয়ের আকৃতি গত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিগত—শক্তিগত কত পার্থক্য। সেই রূপ তোমার আমার সহিত ব্যাস বশিষ্ঠের আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃতিগত সাধন শক্তি-

গত বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। বেদব্যাস মাগ্নেটাইজড্ ছুঁচ আর তুমি আমি কেবলই ছুঁচ [অর্থাৎ ছুঁচো] বেদব্যাসের "তাপসী" শক্তি তাঁহাকে বরণীয় করিয়াছে, তাঁহার প্রকৃতি গঙ্গার সাগর সঙ্গমের ন্যায় অনাদ্যা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন ভাবে সম্মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই জগৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া দৌড়িতেছে। আর আমাদের "তামসী" শক্তি আমাদিগকে জড়বুদ্ধি ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা দিন ২ জগতের বাহির হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং প্রভেদ বিস্তর। স্বর্গ ও নরকে আকাশ ও পাতালে যত খানি প্রভেদ, বেদব্যাস ও আমাদের মধ্যে ততখানি প্রভেদ। আমরা নরকের কীট হইয়া দেবতার আসনে বসিতে যাই। শৃগাল হইয়া সিংহের অধিকার কাড়িয়া লইতে চাই। আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে।

কি ধর্ম্মরাজ্যে কি সাংসারিক রাজ্যে সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খল ঘোটকের মত উন্মুক্ত ময়দানে ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। যখন যাহা প্রাণ চাহিবে;

তখনই তাহা করিলে দুর্ব্বিপত্তির সাগরে ডুবিতে হয়। দেশ কাল, পাত্র ভেদে পিতা মাতা ও গুরুজনের আজ্ঞা ও আপ্তবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই নানাবিধ বিঘ্নসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্ত্তবিক্ষোভিত সংসারসমুদ্রবক্ষে প্রবৃত্তিতরণিকে ধীরে ২ চালাইতে হইবে। এ দুস্তর ভবার্ণবে তুফানের ভয় আছে, প্রবল ঝটিকার আশঙ্কা আছে, গুপ্ত পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সকল দিক্ সামলাইতে হইলে গুরু-কর্ণধারের প্রয়োজন। স্বেচ্ছার স্রোতে গা ভাসাইলে চলিবে না। স্বেচ্ছাচারী জীব কখনও তৃপ্তি পায় না। তাহার অতৃপ্তি দিন ২ বাড়িয়া উঠে।

জীবপ্রকৃতির অভাব—আকাঙ্ক্ষা অনাদি অনন্ত। এ অনন্ত অভাবকে পরিপূরণ করিতে সান্ত পরিচ্ছিন্ন সাংসারিক বিকৃতিময় জগৎ সমর্থ হইবে কেন? যে নিজে সীমাবিশিষ্ট, সে অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন? সে নিজে ক্ষুদ্র, সে মহৎকে

আবরণ করিতে পারিবে কেন ? যাহার তৃষ্ণা বিশ্বব্যাপিনী, ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্বল্প সলিলে তাহার কি কুলাইয়া উঠে ? অগস্ত্য মুনির মত যাহার তৃষ্ণার বিরাট মূর্ত্তি, তাহার জন্য অগাধ সাগরের অসীম জলরাশি চাই, অনন্ত নির্ঝরিণীর অফুরন্ত শীতল সলিলধারা চাই, যাহা চিরদিন প্রাণ ভরিয়া পান করিলেও ফুরাইবে না। অনন্ত মূলপ্রকৃতি আদ্যা শক্তিই ঐ শান্তিময়ী অমৃতনির্ঝরিণী। আইস জীব ! ঐ প্রেমমন্দাকিনীর তটদেশে একবার আসিয়া দাঁড়াও। ত্রিতাপতপ্ত দেহ যদি জুড়াইতে চাও, ঐ পতিতপাবনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ঘাটে নামিয়া অবগাহন কর। পিপাসু জীব ! কোন্ নির্ঝরিণী হইতে ঐ প্রেমপ্রবাহ বাহির হইয়া আসিয়াছে, তৃষ্ণার্ত্ত তুমি, তোমার তাহা জানিবার প্রয়োজন কি ? ও ব্রহ্মতত্ত্বরূপ ঝরণার মূলতত্ত্ব নাই বুঝিলে ? তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ও অনন্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লাভ কি ? বুঝিবার সামর্থ্যই বা কোথায় ! তোমার পিপাসা জন্মিয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তি-

স্থান নাই বুঝিলে, গঙ্গার যে ঘাটে নামিবে, তোমার তৃষ্ণার মত জল সর্ব্বত্রেই পাইবে। আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের অভাব রূপ গোষ্পদখাত তাঁহার অনন্তদয়ার প্রবাহে নিমেষ মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়। বিচার বিতর্ক ছাড়িয়া দাও, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের অভিমান উড়াইয়া দাও, মান অপমানের জ্ঞান দূর করিয়া দাও। এদিক্ ও দিক্ তাকাইও না, সংসারমেলার কোলাহলে কর্ণপাত করিও না, পাঁচ জনের কথায় নিজের কাজ হারাইও না, মানব দেহ ধারণের শুভলগ্ন বৃথা নষ্ট করিও না। মনের অনুরাগে অন্তর্যাগে ভক্তির আবেগে মায়ের চরণাগ্রভাগের অমৃতময় স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, তোমার ত্রিতাপজ্বালা মিটিয়া যাক্। যেচ অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার অনন্ত শক্তি— অনন্ত মাহাত্ম্যের তুলনায় আমার মত কীটানুকীটের অভাব নিতান্তই তুচ্ছ—নিতান্তই নগণ্য। এতু তুচ্ছ অভাবের জন্য তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতেও ভরসা হয় না। যিনি রাজাধিরাজ, মণি মুক্তা হীরকাদি যাঁহার

সতত সঙ্গে থাকে, তাহার কাছে দুইটি পয়সার ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাকে বাক্স খুলিতে যে অনুরোধ করে, সে কি পাগল নহে ? সেই রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল যাঁহার পদকল্পতরুতলে কুড়াইয়া পাওয়া যায়, সেই রাজ-রাজেশ্বরী মায়ের কাছে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র অভাব পূরণ জন্য দয়ার ভাণ্ডার খুলিতে অনুরোধ করা কি নিতান্তই অজ্ঞতা নহে। সুতরাং কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে দয়ার প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইব ? কেহ২ তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকেন মা! আমাদিগকে ভক্তি দাও! আমি কিন্তু বুঝি, আমরা এ প্রার্থনারও অধিকারী নহি। দয়াময়ী মা দয়া করিয়া যদি আমাদিগকে ভক্তি দিতেই আসেন, তাহা হইলে তাঁহার সে দেবভক্তি রাখিব কোথায় ? এ অপবিত্র হৃদয়ের শিষ্ঠা ???ে সে সুধাধারা ধরিব কেমন করিয়া ? এ কঠিন পাষাণে সে সুকোমল অমৃত বল্লরীকে রোপণ করিব কেমন করিয়া ? ভক্তহৃদয়ের দেবমন্দিরে নিভৃতকক্ষে যে কৌস্তুভমণি অতি যতনে গোপনে

রক্ষিত হয়, তাহাকে আমার এই দস্যুপরিবেষ্টিত হৃদয়াগারে রাখিব কোন্ ভরসায় ? সুতরাং তাঁহার কাছে চাহিব কি ? তাঁহার কাছে চাহিব মা ! আমার সম্মুখে একবার দাঁড়াও, এ অপবিত্র হৃদয় পবিত্র হইয়া যাউক ! এ অপরিষ্কৃত হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়া তোমার নিজের বসিবার উপযোগী করিয়া লও । এ বজ্রসম কঠোর হৃদয়ে কুসুমাস্তরণ বিছাইয়া লও । মা ! ইচ্ছা হয়, তোমার দাস বলিয়া আপনাকে মনে করি, কিন্তু মনঃ প্রাণ তখন চমকিয়া বলে, বিধি বিষ্ণু শিব যাঁহার দাস, তাঁহার দাসত্ব করিতে চাও কোন সাহসে ! দেবি ! তোমাকে "মা" বলিতে বড় সাধ যায় । কিন্তু যখন ভাবি, তখন তাহাও বলিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে । কার্ত্তিকেয়ের মত জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ও সুরনর বন্দিত গণাধিনায়ক যাঁহার পুত্র, আমার মত তুচ্ছ জীব তাঁহাকে মা বলিতে পারে কোন্ সাহসে । তোমাকে "ভক্তবৎসল" বলিয়াও ডাকিতে পারি না, কেননা আমি যে পরম অভক্ত । বলিতে পারি

তোমাকে "অনাথবৎসল"। কেননা আমার মত অনাথ দীন দুঃখী এ জগতে আর কেহ নাই। শাস্ত্রে তোমার সহস্রমূর্ত্তি ধারণের কথা শুনিতে পাই। আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। হৃদয়ের অন্তর্যামী দেবতা তুমি, একবার "হৃষীকেশ" মূর্ত্তিতে অন্তরে আবির্ভূত হও। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চারু চরণাভিমুখে চালিত কর। আমার উন্মত্ত মন মাতঙ্গ উদ্দাম হইয়া নানা পথে দৌড়িতেছে। তুমি অঙ্কুশ চিহ্নিত চরণস্পর্শে তাহাকে সুশাসিত কর। মা! কোন্ ভাষায় তোমাকে ডাকিতে হয় তাহা জানি না, কি রূপ সুসংস্কৃত ভাষায় ডাকিলে তুমি কাছে আসিয়া দর্শন দাও, তাহা বুঝি না। শুনিয়াছি, গজকচ্ছপের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন কাতর গজরাজের আর্ত্তনাদে আহূত হইয়া তুমি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণুরূপে দৌড়িয়া আসিয়াছিলে, গজের ভাষা তুমি শুনিতে পাও, আর মনুষ্যের ভাষা শুনিতে

পাও না, উহাতে মনে হয় না। তাই বলি মা! সংসারের সকল কথা ফুরাইয়া দাও, সকল বৃত্তি উড়াইয়া দাও, সকল বাসনা পুড়াইয়া দাও, আমার সকল অভাব ভাসাইয়া দাও, প্রবৃত্তি প্রবাহকে তোমার চরণ-রেণুতে মিশাইয়া দাও।

ভারতে উৎসব।

কুমিল্লা-হরিসভার উৎসবোপলক্ষে

(কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বক্তৃতা)

দুঃখ দুর্ব্বিপাকের নিদারুণ শস্ত্রাঘাতে দেহ মনঃ প্রাণ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যন্ত্রণার বিষম নিষ্পেষণে অস্থি পঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, এমন দুঃসময়েও দুঃখী যদি সুখের স্বপ্ন দেখিতে পায়, ঘোর অন্ধকারেও দীনদুঃখীর পর্ণকুটিরে ক্ষুদ্র আলোকের রেখা যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে সে স্বপ্ন অমূলক হউক, সে তুচ্ছ আলোক ক্ষীণ হউক, ক্ষণিক হউক, সে মুহূর্ত্তের জন্য সে সুখের কণিকায় দুঃখীর মনঃ প্রাণ নাচিয়া উঠে—নিমেষের জন্য দুঃখের তীব্রতা সে ভুলিয়া যায়। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চির আঁধার গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আজ ভারতবর্ষের মত দুর্দ্দিন বিষম দুর্ব্বিপাকের সময়। এ দুঃসময় ভারতে উৎসবের কথা স্বপ্নের

মত হইতে পারে, কিন্তু এ স্বপ্নেও সুখ আছে, শান্তি আছে, এ ভীষণ নৈরাশ্যের সাগরে আশা ভরসার অভয়-কাহিনীর কণিকা মাত্র শুনিলেও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। অনেকে বলিতে পারেন, আজি এ দুঃখের দিনে সুখের কথা কেন? বর্ত্তমান ভারতবর্ষ দুঃখসাগরে নিমগ্ন। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি অর্থনীতি কি ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়েইত ভারত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের বিচিত্র প্রাসাদের চারিদিকেই ত অগ্নি লাগিয়া পুঁড়িয়া ছার খার হইতেছে, এমন দুঃখের দিনে ত মাথায় হাত দিয়া কাঁদিবারই কথা। এমন সময় উৎসব কেন? এ অকাণ্ডতাণ্ডব কেন? যদি কোন নূতন সমৃদ্ধি লাভ হয়, নূতন শ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেইত উৎসব করিবার কথা। কিন্তু ভারত ত যে পরাধীন, সেই পরাধীনই আছে, যে দুঃখী, সেই দুঃখীই আছে, যে শূন্য, সেই শূন্যই আছে, তবে এ উৎসব কেন? তবে এ নূতন জমজমাট কেন! যিনি এ কথা বলেন, তিনি ভারতের মর্ম্মকথা জানেন না।

দুঃখের মধ্যে উৎসব কেন করিতে হয়, ভারতবর্ষ তাহা বুঝে। ভারতবর্ষ বুঝে, কান্নার মধ্যে হাঁসি, আঁধারের মধ্যে আলো, তাপের মধ্যে শীতলতা, শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা চাই। একটি প্রকাণ্ড তৃণস্তূপের মধ্যে অগ্নি কণিকা পড়িলে তাহা যেমন পুড়িয়া যায়, সেই রূপ নিরানন্দস্তূপের মধ্যে আনন্দোৎসবের কণিকা পড়িলে তাহা উড়িয়া যায়। তাই এ বিষম দুঃখের দিনে উৎসবের অবতারণা, তাই এ দুঃখী ভারতকে ক্ষণেকের মত সুখী করিবার জন্যই এ উৎসবব্যাপার সূচনা। উৎসব কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া তরল জলের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়।

এখন উৎসবতত্ত্ব একটু পরিস্ফুট করিতে হইবে। উৎসব ব্যাপারটি বুঝিতে হইবে। তুমুল আনন্দ রোল, তীব্র উৎসাহ, নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন, বিষম আমোদ আহ্লাদ আদি মিলাইয়া যে একটা ব্যাপার, তাহাকেই বলে উৎসব। স্থূলকথায় আনন্দ প্রকাশের নামই উৎসব। আমরা বাহিরের যে সমস্ত কার্য্যে

ব্যাপৃত হই, তৎসমস্তই ভিতরের বিকাশ। আমাদের ভিতরে যে ক্রিয়া অঙ্কুরিত হয়—যে বৃত্তি গজাইয়া উঠে, বহির্জগতে তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ভিতরে ফুল ফুটিলে বাহিরে সুগন্ধ আপনিই ছুটিতে থাকে। ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নি সঞ্চিত থাকিলে বাহিরে তাহার তাপ অনুভব হইয়া থাকে। ভিতরে হাঁসি আসিলে বাহিরের অধরে তাহা প্রকাশিত হয়, প্রাণের ভিতরে সুখানুভব হইতে থাকিলে বাহিরে পুলকোদ্গমাদিরূপে তাহা ফুটিয়া উঠে। সুতরাং ভিতরে আনন্দ থাকিলে তবে ত বাহিরে আনন্দ-প্রকাশ রূপ উৎসব হইতে পারে? কিন্তু আমাদের ভিতরে সুখ কৈ? আমাদের সংসারদাবদহনাবিদগ্ধ অন্তস্তল হইতে দুঃখের চিতাধূম অবিরতই উদ্গীর্ণ হইতেছে। স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ ইহা বোধ হয় বটে, কিন্তু আরও গভীর গর্ত্তে ডুবিয়া, আরও অতল তলে তলাইয়া দেখ, সুখের গুহ্যবার্ত্তা বুঝিতে পারিবে, দেখিতে পাইবে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত সুখের

নির্ঝরিণী শীতল সলিল ধারায় প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাইবে, মনঃ প্রাণ বুদ্ধির অতীত স্থান হইতে কেমন সেই ঝরনার জল বহিয়া আসিতেছে। আমরা যখন জলের জন্য কোন কূপ খনন করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন খননের সময় প্রথম দেখিতে পাই, বালুকা স্তূপ কেবল উঠিতে থাকে, পরে কেবল কর্দ্দম-রাশিই দেখিতে পাই। কৈ প্রথমেত জল দেখিতে পাই না? কিন্তু তখনও আমরা নিরাশ হইনা। বালুকা কর্দ্দম ভেদ করিয়া আরও তলাইয়া যখন খুঁড়িতে থাকি, দূর হইতেও দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত যখন উদ্ঘাটন করিয়া ফেলি, তখন বাঞ্ছিত জলধারা দেখিতে পাই। সেই রূপ শরীর মন আদি স্তর, অন্নময় প্রাণময়াদি-কোষ উদ্ভিন্ন করিয়া যখন দেখিব, তখনই সেই তল-দেশে ত্রিতাপানল নির্ব্বাপন আনন্দের উৎস প্রস্রবণকে দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারিব। কূপখননের প্রথম অবসরে দেখি কেবলই বিশুষ্ক বালি। সেই রূপ শরীরাদি রূপ প্রথম স্তরে আমরা দেখি, কেবলই রূপ, বালুকার

স্থায় কেবলই বিশুদ্ধ ভাব। কূপখননের দ্বিতীয় অবসরে দেখি কর্দ্দম, অর্থাৎ ময়লা মাটি মাখা কতটা জলীয় ভাগ। সেই রূপ মন আদি দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই দুঃখমাখা সুখ। যখন শেষ স্তর ভেদ করিতে পারিব তখনই কূপের নির্ম্মল জল ধারার ন্যায় আত্মার অনবচ্ছিন্ন আনন্দ ধারা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। তাই বলিয়াছি, তলাইয়া দেখ ভিতরে আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোমার একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে তুমি সুখী হও, আবার সেই প্রিয় পুত্রের অভাব হইলে তুমি দুঃখিত হও কেন? পুত্রের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত ত তোমার জানা শুনা ছিলনা, কোন পরিচয়ইত ছিল না। তাহার সহিত কোন চিঠি পত্র লেখা লেখি ছিল না। সুতরাং পুত্র তোমার গৃহে আগন্তুক। আজ একজন আগন্তুক তোমার গৃহে যদি আসে, আবার চলিয়া যায়, তাহার জন্য তুমি যেমন সুখী বা দুঃখী হওনা, সেই রূপ আগন্তুক পুত্রের জন্ম বা মরণে

তোমার সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, আগন্তুকের জন্যই সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। পুত্রের শরীরটিকে আমরা ঠিক ভাল বাসি না। পুত্রের শরীরটিকে ভাল বাসিলে তাহার পরিবর্ত্তনে আমাদের দুঃখ হইত। বালক পুত্র যখন যুবা হয়, আবার যুবা পুত্র যখন বৃদ্ধ হয়, তখন যৌবনাবস্থায় বালক পুত্র মরিয়া যায়, বৃদ্ধাবস্থায় আবার যুবা পুত্রও ত মরিয়া যায়, কৈ তাহার জন্য ত আমাদের দুঃখ হয় না। সুতরাং শরীর রূপ পুত্র আমাদের ভালবাসার ধন নহে। আমরা পুত্রের তেমন জিনিষটিকেই ভাল বাসি, যাহার সহিত কখনও আমাদের পরিচয় নাই, জানা শুনা নাই, সেই অজানা অচেনা বস্তুর কি জানি কি কুহকে আমরা আবদ্ধ, তাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারি না। পুত্রের শরীরটিকেই যদি ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে পাঠশালায় গুরু মহাশয় লেখা পড়া শিখাইবার জন্য পুত্রের শরীরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। কেননা

তখন মন বুদ্ধি রূপ পুত্রকে ভাল বাসি। পুত্র যদি লেখা পড়া না শেখে, বুদ্ধিহীন মূর্খ হয়, ত তেমন পুত্র বাঁচিয়া লাভ কি? সুতরাং তখন শরীর ছাড়িয়া মন রূপ পুত্রের দিকেই ভালবাসার গতি হয়। কেননা তখন মনে হয়, শরীর রূপ পুত্র গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইলেও মন রূপ পুত্র ত সুপুষ্ট সুশিক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই তখন আনন্দ হয়। আবার লেখা পড়া শিখিয়াও পুত্র যদি অদৃষ্টদোষে দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া দুষ্ট দুরাত্মা হইয়া উঠে, ত তেমন পুত্রকে আমরা চাহি না। তখন আত্মরূপ পুত্রকেই ভাল বাসি। দুর্নীতি পাপাদি মলিনতায় সে আত্মা রূপ পুত্র কলুষিত হইলে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়। সুতরাং আমাদের ভালবাসার গতি বাহ্যস্তর ভেদ করিয়া ধীরে ২ কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া অন্তঃস্তরের দিকেই ছুটিতে থাকে। একটা গুরুভার বস্তুকে আকাশের দিকে উঠাইয়া দাও, দূর ২ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া সে চলিয়া যাউক, সে অনন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে কিন্তু কিন্তু থাকিতে পারিবে না। পৃথিবীর দিকে

পুনরায় তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যে তাহাকে টানিতেছে, সুতরাং তাহার পৃথিবীর সহিত ভালবাসাময়ী গতি নিম্নাভিমুখী না হইয়া থাকিতে পারে না। ঘোর উচ্চতা হইতে নিম্নতার দিকেই ভালবাসা দৌড়িয়া থাকে। বাহির হইতে ভিতরের দিকেই ভালবাসা ছুটিয়া থাকে। সুতরাং ভালবাসার গতি অন্তর্ভেদিনী। তাই পুত্রের বাহিরের শরীরাদি রূপ স্তর ভেদ করিয়া ভালবাসা অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশে ডুবিতে চায়, উপরে না ভাসিয়া অনন্ত প্রেমাম্বুধির অতল জলে ভালবাসা তলাইতে চায়। ভালবাসা তাঁহারই প্রিয়তার সৌগন্ধ পাইয়া আকৃষ্ট হয় যিনি অন্তস্থলে বাস করিতেছেন। যাহা প্রিয়, তাহা সুখময়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দস্বরূপ।

সংসারের সুখ দুঃখ যাহা কিছু, সমস্তই আমাতে। (এখানে মন বুদ্ধি রূপ আমাকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছি, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া নহে) সুখ দুঃখ

বাহিরের পদার্থের ধর্ম্ম নহে, সমস্তই মনের অবস্থা মাত্র। আজ মনের এই দুইটি অংশ মুছিয়া গেলে পুত্রের জন্ম মরণে আর সুখ দুঃখ অনুভব হইতে পারে না। যদি সুখ দুঃখ বাহিরের পদার্থের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে একই পদার্থ এক সময়ে সুখময়, অন্য সময়ে দুঃখময় হয় কেন? যখন মানব সংসারী গৃহস্থ থাকে তখন ভোগ্য বিলাসময় পদার্থে কত সুখ বোধ করে, আবার যখন বৈরাগী সন্ন্যাসী হয়, তখন সেই সমস্ত পদার্থই দুঃখময় অনুভব করিয়া ত্যাগ করে। এক সময়ে যাহাতে আনন্দ হইত, অন্য সময়ে তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল কেন? এক সময়ে যে অগ্নি তাপ দেয়, অন্য সময়ে তাহাতে কি শীতলতা পাওয়া যায়? তাপ নাকি অগ্নির ধর্ম্ম, তাই অগ্নি চিরদিনই তাপময়, সুখ বা দুঃখ সেই রূপ পদার্থের ধর্ম্ম যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু চির দিনই সুখময় বা দুঃখময় হইত। কিন্তু তাহাত হয় না। সুতরাং সুখ দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। যখন মানব সংসারী থাকে, তখন মনের যে

ভাব, বৈরাগ্য অবস্থায় সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সংসারী অবস্থায় মনের যে প্রীতিময় অংশ সংসারে ছড়াইয়া দেয়, বৈরাগ্যাবস্থায় তাহা উঠাইয়া লইয়া থাকে। তাই সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সুখ দুঃখ, প্রীতি অপ্রীতি, অনুরাগ ও দ্বেষ মিত্রতা ও শত্রুতা সমস্তই মানবের মনে। চিরকাল যাহাকে শত্রু বলিয়া জানি, বিজয়া দশমীর পবিত্র উৎসবে তাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকি। শত্রুতা যদি ব্যক্তিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বিজয়া দশমীর দিনে "শত্রু" আবার "মিত্র" হইল কেমন করিয়া? আমার মনে যে শত্রুতা ছিল, তাহা নাকি বিজয়া দশমীর পবিত্র শক্তিতে মুছিয়া গিয়াছে, তাই প্রেম-ভরে শত্রুকে মিত্র করিয়া লইলাম। সুতরাং উৎসব শত্রুকে মিত্র করে, নিবিড় নিরানন্দে প্রসন্নতা আনিয়া দেয়। উৎসব ক্ষুদ্রকে মহান্ করে, অচেতনকে সচেতন করে, মলিনকে উজ্জ্বল করে, ক্ষীণকে তেজীয়ান্ করে, শূন্যকে পূর্ণ ও অভাবযুক্তকে প্রভাবযুক্ত করিয়া দেয়। উৎসবের শক্তি আশ্চর্য্য ও অনিবার্য্য।

সুখ দুঃখাদি সমস্তই জীবের ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাহিরে সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে না। ভিতরে প্রচ্ছন্নরূপে যে সুখসুধা বিদ্যমান, তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিলে আর ভাবনা কি? বাহিরে দুঃখ বিনাশের চেষ্টা বৃথা, ভিতর হইতে দুঃখমূল উৎপাটিত করিতে না পারিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। পরম কারুণিক ভগবান্ সমস্তই আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, আমাদের অন্তর্ভাণ্ডার ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন। কিসের জন্য আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে? আমাদের নিজের মর্য্যাদা নিজেরই কাছে আছে। গবর্ণর জেনেরলের লেভিতে যদি বসিবার অধিকার না পাও তাহাতে তোমার অমর্য্যাদা কি? তোমার যে হৃদয়-দরবারে অন্তর্য্যামী রাজরাজেশ্বর বাস করিতেছেন, সেই দরবারের দরবারী জীব তুমি, তোমার মর্য্যাদার ভাবনা কিসের? বাহিরের ব্যাপারে তোমরা দীন দুঃখী পরপদানত ঘৃণিত তুচ্ছজাতি, সুতরাং এমন অবস্থায় উৎসব করিবার কথা নাই বটে, কিন্তু

ভিতরের দিকে তাকাইলে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে তাকাইলে উৎসব সম্বন্ধে মানব আশান্বিত হইতে পারে। বাহিরের সংসার দুঃখময় বটে, বাহিরের মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণ রাজ্যে প্রবেশ করিলে সেখানেও দেখিতে পাই, দুঃখ মিশ্রিত সুখের লীলা, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও নিম্ন তলে নামিলে দেখিতে পাই, যিনি মনের মন, অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, সেই অতীন্দ্রিয় দেবতা নিত্য সুখের লহরীলীলায় সদা ভাসমান। তাঁহারই সুখের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া মনে সুখাভাস আসিয়াছে, সেই সুখসূর্য্যের কিরণরাশির প্রতিবিম্ব মাত্র পাইয়া এ পতিত দুঃখপূর্ণ জগৎ হাঁসির সুনির্ম্মল শুভ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে। সুতরাং যদি উৎসব করিতে হয়, ত তাঁহাকে লইয়া। ভারতবর্ষ তাঁহাকে ভুলিয়া কখনও উৎসব করে নাই। ভারতের প্রত্যেক উৎসব সেই আধ্যাত্মিক সূত্রের তারে ২ গাঁথা। ভারতের ভিতর ভাগ মহোৎসবময়। মধ্যের তাহারই ছায়া তাহারই সৌরভ বাহিরে

আসিয়া সংসারকে সুশীতল করিয়া থাকে। ধন্য জীব তাঁহারাই, যাঁহারা এই বিষ্ণু পাদোদ্ভবা মহোৎসব-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

৭। জড়বাদী জড় পদার্থ ছাড়া কোন আত্মশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতটি এই স্থানে একটু সমালোচনা করিতে চাই। জড়বাদীও স্বীকার করিবেন, আমাদের সম্মুখে যে পদার্থরাজি রহিয়াছে, এই পদার্থের স্বরূপ আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় না, বস্তুকে আমরা দেখিতে পাই না। বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে রূপ যে ব্যাপকতা, যে আকৃতি অবয়ব, যে লম্বাই চোড়াই আদি গুণ গুলি থাকে তাহাকেই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং বস্তুর উপলব্ধি হয় না, বস্তুর গুণ বা শক্তির সহিতই কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে। এই শক্তিকেই আমরা আদর করিয়া থাকি। পদার্থকে আদর করি না। পদার্থের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ কোন প্রয়োজন নাই। তোমার জ্বর হইয়াছে, কুইনাইন রূপ ঔষধকে

তুমি চাও কেননা জ্বরঘ্নতা শক্তি তাহাতে আছে। আজ জ্বরঘ্নতা শক্তি কুইনাইন হইতে যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কুইনাইন তোমার পক্ষে আর আদরের সামগ্রী নহে। কুইনাইনের জ্বরঘ্নতা শক্তিকেই তুমি ভাল বাস। ঔষধালয়ে ঔষধ অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহা ফেলিয়া দেয় কেননা তাহার শক্তি চলিয়া যায়। সুতরাং জগৎ শক্তিরই উপাসক—শক্তিরই সেবক। শক্তি ছাড়া পদার্থ অপদার্থ—বিড়ম্বনা মাত্র। বাহিরের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া এই অন্তঃশক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাহিরের মহল ভেদ করিয়া, যে অন্দর মহলে আমাদের ভাল বাসার ধন বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে অন্দরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন তাঁহার চরণ তলে শরণ লইতে হইবে। সেই লোকালোকবন্দিত চারুচরণ সুধাসিন্ধু হইতে উচ্ছলিত হইয়া আনন্দপ্রবাহ জীবকে অশেষ দুঃখ হইতে নিস্তার করে। এই সুধা-সিন্ধুর বিন্দু মাত্র স্পর্শে জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়।

আমরা আধারকে চাই কেন, আধেয় শক্তি আছে বলিয়া। ইক্ষুকে মিষ্ট বলি কেন? ইক্ষুর "রস" মিষ্ট বলিয়া। আমাদের শরীরাদি যেন ইক্ষুদণ্ড স্বরূপ, আর আত্মা ইহার রস স্বরূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈসঃ"। এই রসের আস্বাদ যে দিন জীব করিতে পারিবে, সেই দিন তাহার চিরদিনের নীরস জীবন সরস হইয়া যাইবে। এই আনন্দের প্রস্রবণ হইতে যে দিন সুখসুধার উৎস নিঃসৃত হইয়া আসিবে সে দিন সে আনন্দধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। সংসারের সুখ আপাততঃ সুখ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহাতে দুঃখই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক সুখের উদয় কালে পূর্ব্ব দুঃখ স্মৃতি হয়। সুখের দিনে দুঃখের কথা মনে পড়ে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। দুঃখের দুঃখত্ব স্মৃতি না হইলে সুখের সুখত্ব অনুভবই হইতে পারে না। কেননা সুখ দুঃখ পরস্পর মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে সুখের উদয়ে দুঃখ, পরিণামে দুঃখ, কেবল ভোগকালে বিদ্যুতের ন্যায়

অনুভূত হইয়া যাহা অবসান হয়, তেমন সুখ সুখই নয়। যাহার ক্রিয়াতে সুখ, পরিণামে সুখ, ভোগ করিবার সময় যাহাতে সুখ, বরফ যেমন জলময়, সেই রূপ যাহা সুখময় সেই বস্তু পাইবার জন্যই জীব লালায়িত। আর্য্যজাতি ধর্ম্মকেই সেই সুখের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কোন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ একাদশীর উপবাস রূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন বাহিরের লোকে হয় ত মনে করিতে পারে, উপবাসে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মাত্মক পুরুষ তাহাতে কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি ভাবেন, আজ কি তাঁহার পক্ষে শুভদিন, যে তিনি এই রূপ ধর্ম্মকার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। এই সুমহৎ চিন্তায় তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দিত হয়। দুর্গোৎসবের সময় ক্রিয়াকর্ত্তা যখন ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তখন হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাঁহার একটু জল গ্রহণ করিবার অবসর হয় না। উহার দরুণ তাঁহার ত কিছু মাত্র কষ্ট হয় না। বরং চারিদিকের ভোজন ব্যাপারে

তাঁহার মনে এক অভূত পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, তিনি সে আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠেন। এই যে একাদশী উপবাস ও ব্রাহ্মণ ভোজন রূপ ক্রিয়া, এই ক্রিয়া করিবার সময় সুখ। আবার এই ক্রিয়ার পরিণামে সুখ, অর্থাৎ তাদৃশ ক্রিয়া জনিত পুণ্য দ্বারা স্বর্গাদিলাভ হয়, সেই স্বর্গসুখ ভোগ করিবার সময় সুখ, সুতরাং ইহা সুখময়। এ সুখের উপর সুখ দুঃখশাখা মলিন মনোরাজ্যের কোন রূপ আধিপত্য নাই, ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিজস্ব, তাই ইহা সুখময়। এই রূপ শ্রেণির সুখকেই হিন্দু সুখ বলিয়া বুঝেন, তাই তাঁহার চক্ষে পার্থিব সুখ উপেক্ষিত। হিন্দুর প্রত্যেক ধর্ম্ম কর্ম্ম এই রূপ সুখময় কিন্তু অদৃষ্টদোষে বর্ত্তমান ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই ধর্ম্মকার্য্য করিবার সময় লোকে কষ্টই অনুভব করিয়া থাকে।

৮। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মরূপ সুখসূর্য্যের কিরণ রাশির প্রতিবিম্ব মাত্র পাইয়াই মনোরাজ্যে সুখের অংশ আসিয়াছে। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

" আনন্দময়ো হ্যাত্মা, এতস্যৈব আনন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি সর্ব্বে আনন্দাঃ "

যাহার নকল পাইয়া এত সুখ, সেই আসল জিনিষটিকে পাইলে না জানি কত সুখ হয়; কিন্তু তাহার জন্য মায়াবিমুগ্ধ জীবের চেষ্টা হয় না। নিদারুণ শীতকালে তুমি শীতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ, প্রাতঃকালে শীতে থর ২ করিয়া কাঁপিতেছ, বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বিছানাতে বসিয়াই তুমি যদি রৌদ্র পোহাইতে পাও, তবে তোমার বড় আনন্দ হয়, রৌদ্রে তোমার শীত নিমিত্ত জড়তা কাটিতে পারে। এই আন্তরিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি জানালা খুলিয়া রাখিয়াছ, আশা আছে, জানালার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তোমার গায়ে পড়িবে, তোমার শীতার্ত্ত জড় দেহকে কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যদি সূর্য্যরশ্মির সমসূত্রপাতে জানালা খোলা থাকে তবে ত রাশিরাশি জানালার ভিতরে প্রবেশ করিবে। সূর্য্যের রশ্মি আসিতেছে এক দিকে, আর জানালা

খোলা থাকে যদি অন্যদিকে, তবে তুমি রৌদ্র উপভোগ করিবে কেমন করিয়া ? এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত কথাটা মিলাইয়া দেখ। সংসারের নিদারুণ শীতে আমরা সদাই আর্ত্ত—পীড়িত—জড়। ইচ্ছা যায়, ঘরে বসিয়া সুখসূর্য্যের রৌদ্র পোহাইতে। তাই শরীর রূপ গৃহে মন রূপ জানালা খুলিয়া রাখি। যিনি সুখসূর্য্য জ্যোতিঃগুণময়, তাঁহা হইতেও কিরণ মালা অবিরত চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যরশ্মি অনুভব করিতে পাই না কেন ? যে হেতু মনরূপ গবাক্ষদ্বারকে তাঁহার সমসূত্রপাতে (মুখো মুখি) করিয়া খুলিয়া রাখিতে জানিনা। তাঁহার কিরণের প্রবাহ আসে এক দিকে, আমাদের জানালা খোলা থাকে অন্যদিকে অর্থাৎ সংসারের দিকে। তাই সে কিরণ স্বরূপতঃ উপভোগ করিতে পাই না। তাহার একটা আবছায়া পাই মাত্র। সে কিরণ প্রাপ্ত হইলে সমস্ত জড়তা মিটিয়া যায়, যে বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্দীরিত হইলে সংসারবিষমূর্চ্ছিত অচেতন মনঃপ্রাণ সচেতন

হইয়া উঠে, দুর্ভাগা জীব! সেদিকে একবার তাকাইলে না। কেবল তাহার প্রতিচ্ছায়া লইয়া তুমি মজিতে চাও, আসল ফেলিয়া নকলে ভুলিতে চাও, সোণা ফেলিয়া গিলটিতে মোহিত হইতে চাও, রূপা ফেলিয়া রাং লইয়া নৃত্য করিতে চাও, তাহাতে প্রকৃত সুখ পাইবে কেন? চন্দ্রপ্রেম পাগলিনী কুমুদিনী চাঁদের কাছেই সুধার ভিখারিণী হইয়া থাকে, তাঁহারই দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। চাঁদের যে প্রতিবিম্ব জলেতে পড়ে, তাহার কাছে সে প্রার্থক বেশে দাঁড়ায় না, সেই রূপ সুখসুধা যদি চাহিতে হয়, তবে জীব! তোমার অন্তরাগনতল যে মোহন চন্দ্রমার মৃদু মধুর দিব্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইতেছে একবার তাঁহার দিকে তাকাও! সেই পূর্ণেন্দুর বিমল মাধুরীর ধারায় যে দিন অবগাহন করিতে পারিবে, সে দিন আর তোমার ভাবনা কিসের? সে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছবি এ বহির্জগতে সুখের আশা করিও না।

পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, দুঃখী জীবকে সুখী

করিবার জন্যই উৎসবের অবতারণা। জীব ও সকলেই দুঃখে নিমগ্ন, কেননা দুঃখের ভাগই জগতে বেশী। এই দুঃখের তীব্রতা লাঘব করিবার জন্যই মধ্যে ২ উৎসব প্রয়োজন। পূজা পর্ব্ব লইয়াই হিন্দুর উৎসব। অন্যান্য দেশের উৎসব কেবল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া, বিলাস বিভবের সামগ্রী লইয়া কিন্তু হিন্দুর উৎসব তাঁহাকে লইয়া। উৎসবে এমন ব্যাপার সমূহ অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে অপ্রসন্ন মনেও প্রসন্নতা আসে। হিন্দুর পূজার সময়ে যখন শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠে, ধূপের সৌগন্ধ ছুটিয়া উঠে, আরাত্রির দীপমালা জ্বলিয়া উঠে, তখন বিমর্ষ মনেও প্রীতির সঞ্চার হয়। দয়ালু আর্য্য ঋষি দুঃখী জীবের প্রতি তাকাইয়াই অন্তর্জগতের আধ্যাত্মিক ছায়া লইয়াই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আনন্দসাগরে ডুবিয়াছিলেন, যে রসসাগরে আত্মহারা হইয়াছিলেন, জীবকে সেই সুখে সুখী করিবার জন্যই উৎসব রূপ আনন্দময় সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে গুপ্ত

ভাণ্ডার-লাভ হইতে সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন, যে অধ্যাত্মরাগের মহোৎসবে মাতিয়াছিলেন, কেবল একাকীই তাহা তিনি উপভোগ করেন নাই, দীন জগতের জন্য সেই গুপ্ত গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। কেননা তিনি যে দয়ালু। জানি তোমার বিপুল সম্পত্তি আছে। কিন্তু তোমার সে বিপুল সম্পত্তির কণিকা মাত্রও যদি আমার মত দীন দুঃখীর উপকারে না আসে, তবে তুমি আমার কাছে ধনী কিসের? আর্য্য ঋষি যে সাধের ধন পাইয়াছিলেন তাহা জগতে বিলাইয়া গিয়াছেন, কেননা অতুল দয়া তাঁহার, তাই এ দুঃখীদের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাঁহার দয়া না হইলে কলিকলুষদূষিত আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবের গতি হইত না।

স্বয়ং ক্রিয়া করিলে যেমন একটা ফল পাওয়া যায়, অনেক সময় স্বয়ং ক্রিয়া না করিলেও সেই ফল দেখিলে ভিতরে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেখ, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া হইলে বাহিরে তাহার

ফল কান্না রূপে প্রকাশিত হয়, ইহা যেমন দেখা যায়, সেই রূপ ইহাও দেখা যায়, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া না হইলেও অপরের কান্না দেখিলে অপরের মলিন মুখে অশ্রুধারা বহিতে দেখিলে তোমারও দুঃখের উদ্রেক হয়, তোমারও মুখে কান্না আসে। তুমি হয়ত বেশ আনন্দে আছ, কিন্তু তুমি সেই অবস্থাতেই যদি এমন একটা দুঃখের মণ্ডলীর মধ্যে গিয়া পড়, যেখানে দুঃখের আর্তনাদ ছাড়া আর কোন কথা নাই, কান্না ছাড়া আর কোন ব্যাপার নাই, তেমন স্থানে তুমিও নিজে না কাঁদিয়া থাকিতে পার না। এই রূপ কোন সুখের হাঁসির হুল্লোড়ের মধ্যে পড়িলেও তুমি দুঃখী হইলেও না হাঁসিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং অপরের ক্রিয়ার ফল দেখিয়া তোমারও ভিতরে ক্রিয়া হয়। যে উৎসবে দশজনে মিলিয়া আনন্দ করে, সেই আনন্দমণ্ডলীর মধ্যে পড়িলে তুমি অত্যন্ত দুঃখী হও না কেন, সে মুহূর্তের জন্য তুমি আনন্দাংশের ভাগী না হইয়া থাকিতে

পার না, সুতরাং উৎসব নিরানন্দের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাভূত করে। উৎসবের তেজে নিরানন্দ দূরে চলিয়া যায়। অতএব এ দুঃখপূর্ণ সংসারে উৎসব চাই। যদি উৎসব না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসার মরুভূমি হইত। উৎসবই সংসারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, উৎসবই জগৎকে স্থিতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। উৎসব না থাকিলে দুঃখচক্রের অবিরত পিষ্টপেষণে সংসার ভস্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। উৎসব শ্মশানে জীবনী শক্তির বিকাশ করে। মরুভূমে অমৃতের নদী প্রবাহিত করে। পাষাণে অমৃত বল্লরীকে অঙ্কুরিত করে। তাই উৎসব জীবের পক্ষে বড় প্রিয় পদার্থ। হিন্দু উৎসবের শক্তি বুঝিতেন, তাই দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ পার্ব্বোৎসবের বিধান করিয়াছেন। হিন্দুর উৎসবের দুইটি পৃষ্ঠ আছে, একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য ইহা এক ব্যাপার মাত্র। ভিতরের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি ইহা

কেবল সাধনার স্তর। প্রকৃত সুশিক্ষক যেমন টিয়া পাখির মত পুঁথির বুলি অভ্যাস না করাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থ পুঞ্জ হইতেই শিশুকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন, সেই রূপ আর্য্য ঋষি এই প্রাকৃতিক উৎসবের ভিতর দিয়া জীব-শিশুকে গভীর সাধনার তত্ত্বকথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুর উৎসব কেবলই কাল্পনিক নহে। ছেলে খেলা নহে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মরেখায় বিজড়িত। অগাধ সাধনার তত্ত্ব ইহার ভিতর অবগুণ্ঠিত। উৎসবতত্ত্বের স্তর উদ্‌ঘাটন করিয়া আমরা তাহা ক্রমে ২ দেখাইতেছি।

বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে যখন সকলেই পীড়িত হইয়া উঠে, সূর্য্যদেব অগ্নির ফোয়ারার মত যখন প্রচণ্ড রৌদ্র বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন সে তাপশক্তির তীব্রতায় শীতলতা শক্তি নিতান্ত অভিভূত হইয়া যায়, জীব নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বিষম সন্তাপময় সময়ে হিন্দু ত্রিতাপতারিণী গঙ্গাদেবীর আরাধনা করেন। শীতকালে গঙ্গাপূজার বিধি নাই, কেননা তখন প্রয়োজন নাই। পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা শীতলতার

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাই নিদাঘের ভীষণ তাপে হিন্দু তাঁহার চরণ তলে শরণ লয়। গঙ্গাপূজার পর জগন্নাথের স্নানযাত্রা। [জ্ঞান] গঙ্গার পূত বারিতে জগন্নাথ দেব [আত্মা] বিধৌত হইয়া মলিনতাবর্জ্জিত হইয়া যখন স্বচ্ছ হইয়া উঠেন, তখনই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, তাই স্নানযাত্রার উৎসব। জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাই স্নানযাত্রার পর রথযাত্রা। শরীর রূপ রথে জগন্নাথ রূপ আত্মার দর্শন হইলে পুনর্জন্ম থাকে না। (রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে) কেবল তাঁহাকে দর্শন করিলে তৃপ্তি হয় না। আদরের সামগ্রীকে নিজস্ব করিতে না পাইলে প্রাণ পুলকিত হয় না। তাই সাধক মা যশোদার ন্যায় জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া কোলে করিয়া সোহাগ করিবার অবকাশ পান। অঞ্চলের নিধি সাধের ধনকে বুকে রাখিয়া তাপিত জীবন শীতল করেন। শরতের শারদীয়া মূর্ত্তিতেই সাধক তাঁহার সাধের দেবতার পূর্ণ বিকাশ

দেখিয়া থাকেন। ত্রিভুবনের রাজরাজেশ্বরী মা তখন ত্রিজগতের মা হইয়া অপরূপ রূপ লাবণ্য লহরীর তরঙ্গ লীলায় দিগন্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়া ব্যাপক রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার সে পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রকৃতি নবনধর বেশে সজ্জিত হইয়া উঠেন। বর্ষার বারিধারায় স্নাত হইয়া পবিত্র ভাবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রকৃতি যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রকাশে শারদীয় নির্ম্মল আকাশ উজ্জ্বল চন্দ্র তারকায় সুসজ্জিত হয়, বনের তরু মনের মত সুচারু সুরভি কুসুম দামে তাঁহার পূজা করে। শিশির বিন্দু রাশি মণি মুক্তার ন্যায় তৃণশস্যময় ভূতল উজ্জ্বল করিয়া দেয়। মাকে দেখিবার জন্য যেন ত্রিলোক হাঁসিতে ভাসিতে থাকে।

সামান্য মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য মহিষমর্দ্দিনী মায়ের এত আড়ম্বর কেন ? অভিমান রূপ অসুর অতিভয়ঙ্কর। ঘোর সমাধিকালেও অভিমান বিনষ্ট হয় না। তখন সাধুরহং এ অভিমান কোথা হইতে আসিয়া জুটে। ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার

জন্যই মহাশক্তির এ আড়ম্বর। রাবণ রূপ অহঙ্কারকে বিনষ্ট করিবার জন্যই রামচন্দ্র এই শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। সহস্র কমলে তাঁহার চরণ কমল পূজা করিয়া ছিলেন। সুষুম্না মার্গে কুল কুণ্ডলিনীকে উত্তোলন করিয়া সাধক সহস্রারবিন্দে তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছিলেন। ভারতে যদি এ উৎসব না আসিত তাহা হইলে এমন পবিত্র ভাবময় আনন্দোল্লাসের সম্পত্তি হইতে সমাজ চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইত। ভারতের পরম সৌভাগ্য যে এই রূপ উৎসবের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারে জীব যখন অন্ধীভূত, নিদ্রার গভীর সাগরে জীব যখন নিমগ্ন, তখন প্রসুপ্ত জীবকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই ভক্তজনপালিকা করালা কালিকা মুণ্ডমালিকা মূর্ত্তির আবির্ভাব। ভারতের ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে নীরব শ্মশানক্ষেত্রে হতচেতন ভারতকে ভীম ভৈরব নির্ঘোষে জাগ্রত করিবার জন্যই রণরঙ্গে নৃত্যকালী নাচিয়া থাকেন। শ্যামা দুষ্ট অভক্তগণের পক্ষেই ভীমা, কালী অসুর গণের পক্ষেই বিকরাল-

বদনা, কিন্তু ভক্ত গণের পক্ষে অভয়দায়িনী। সিংহী অপরের কাছে বিভীষণ হিংস্র জন্তু হইতে পারে, কিন্তু নিজের শিশুর পক্ষে সে মা, সেই রূপ শ্যামা নিজ ভক্ত শিশুর পক্ষে স্নেহময়ী জননী। নৃসিংহমূর্ত্তি দুষ্ট হিরণ্য কশিপুর পক্ষে করাল কৃতান্ত, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের কাছে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ। শ্যামা আবার হাঁসিতে ২ শান্তিময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। প্রবুদ্ধ জীবকে আনন্দিত করিবার জন্যই সংহারিণী মূর্ত্তির পর তাঁহার এ জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ জগদ্ধারিণী মূর্ত্তি। অনন্তর দুর্দ্দলের বল বিধান জন্য জিতেন্দ্রিয় কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে তিনি আবির্ভূত হন। তার পর রাসলীলা। এখানে ভক্তি প্রেমাকারে পরিণত হইয়া সাধককে সাধিকা সাজাইয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন। অনাদ্যা প্রকৃতি চৈতন্যের সহিত অভিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়। আরাধিকা সাধিকা রাস রসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দেন। এই মিলনের পর আনন্দলহরী প্রাপ্ত হওয়া চাই, প্রেমের পর প্রেমানন্দ

উপভোগ করা চাই তাই রাসলীলার পর বীণাবাদিনী বাগ্‌বাদিনী আসিয়া বসন্ত ঋতুর উদ্‌বোধন করিয়া দেন। ভরা বসন্তের মলয় মরুত হিল্লোলে প্রেমোল্লাসের ভাব যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময়েই দোলযাত্রার ব্যবস্থা। রাসলীলায় কেবল মিলনের ব্যাপার, দোল-যাত্রায় কেবল মিলনানন্দ উপভোগের ব্যাপার। তাই আবিরের ছড়াছড়ি, আনন্দের অতুল কল্লোল। ইহাই সাধনার চরমাবস্থা। এই কোমল ভক্তি যোগে যাহার কিছু হয় না, মলিনতা বিশুদ্ধতায় হৃদয় যাহার আচ্ছন্ন, তাহারই পক্ষে হঠযোগাদির কঠোর বিধি বিহিত হইয়াছে। তাই সর্ব্বশেষে চড়ক পূজার ব্যবস্থা। নাক ফোঁড়া পিঠ ফোঁড়া, জলে ডুবিয়া থাকা আদি ব্যাপার এই পূজার অঙ্গ। এ সমস্ত হঠ যোগের প্রক্রিয়া মাত্র।

এতক্ষণে বুঝিলাম ভারতের সমস্ত উৎসবই আধ্যাত্মিক সূত্রে গাঁথা। এখন অনেকে বলিতে পারেন এত গুলি উৎসব থাকিতে আবার এ হরিসভার উৎসব কেন? এ নূতন উৎসবের সৃষ্টি হইল কেন? একথার উত্তর আমরা দিতে চাই।

পূর্ব্বে যে সমস্ত উৎসব উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ধ্যান চাই, যোগ চাই, পূজা পাঠ চাই, নিয়মমত কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান চাই। সুতরাং তাহাতে শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। আমরা কলিযুগের নিতান্ত মন্দ অধিকারী শক্তিহীন জীব, আমাদের পক্ষে এমন উৎসব চাই, যাহা শক্তিহীন হইয়াও করিতে পারি। তাই এ নামের উৎসব আমাদের পক্ষে উপযুক্ত উৎসব। আমি কর্ম্ম কাণ্ডত্যাগ করিতে বলিতেছি না, আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে আমাদের মত দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে এই নামোৎসবই সহজসিদ্ধ সাধনা, কেননা ইহাতে শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। আমরা দীন দুঃখী পথের কাঙ্গাল, অর্থ ব্যয় করিয়া উৎসব করিতে পারিব না। যে উৎসব নিঃসম্বল হইয়াও করিতে পারে, আমরা তাহাই চাই। আমাদের মত দীন দুঃখীর প্রতি কৃপা করিয়াই মহাপুরুষগণ এই নামোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে নামগাথা গান করিবার জন্য লালায়িত, সেই নাম কীর্ত্তন করিবার অবকাশ

পাইয়াছি, সুতরাং আমরা ধন্য। যোগীন্দ্র পুরুষ যে নাম সুধা পান করিতে২ মহাযোগনিদ্রায় স্তম্ভিত হইয়া যান, সেই নামের উৎসবে মাতিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। পাতক মহাপাতকাদি যে ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হয়, সেই করুণানিধান ভগবানের গুণবাদ শুনিবার জন্য তাঁহার মহিমা কথন জন্য তাঁহার ভাবে তাঁহার নামে মাতিবার জন্য তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহাকে মনঃ প্রাণে ধারণা করিবার জন্য সভার এই মহোৎসবের অবতারণা। তাঁহার নাম প্রেমভরে উচ্চারিত হইলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সুশীতল হয়। আজ আসুন সকলে জন্ম জীবন সফল করিবার জন্য প্রাণ ভরিয়া বলি, হরি হরি বোল। যেন সকল কার্য্যের প্রারম্ভে মধ্যে ও অবসানে বলিতে পারি হরি হরি বোল। যেন ভিতরে বাহিরে তাঁহারই সত্তা অনুভব করিয়া কায় মনোবাক্য বলিতে পারি হরি হরি বোল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

নিজ নিকেতন যাত্রা।

দুঃখী হইতে ধনী পর্য্যন্ত ভিখারী হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত জগতের সকলেই ইচ্ছার দাস—কল্পনার দাস। দীন দরিদ্র যেমন নিজ ২ কল্পনার বিচিত্র চিত্রের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ, মহারাজ চক্রবর্ত্তীও সেই রূপ বিমুগ্ধ। উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়তম বস্তু পাইবার পিপাসা জগতের সকলেরই সমান। এ অংশে কাহারও সহিত কোন তারতম্য নাই, তারতম্য কেবল সামর্থ্য লইয়া অধিকার লইয়া। ফুটন্ত ফুলের রাশ তোমার উদ্যানে শোভায় উথলিয়া উঠিতেছে। ফুলের মনোমুগ্ধকরী মাধুরীর ধারায় দীন পাথকের চিত্ত যেমন বিমুগ্ধ হয়, ফুল লইবার জন্য তাহার প্রাণে বাসনা যেমন জাগিয়া উঠে, তুমি বাগানের মালিক, তোমারও ফুল লইবার জন্য তেমনই সাধ যায়। কিন্তু তারতম্য এই, তোমার সাধ পুরিবার উপায় আছে, কেননা বাগান তোমার

নিজের অধিকৃত। দীন পথিকের সে সম্ভাবনা নাই, তাহার মনের আশা মনেই বিলীন হয়, অন্তরের পিপাসা অন্তস্তলেই ডুবিয়া যায়। ধনীর বিলাসভোগে ধনীরই এক চেটিয়া অধিকার। নির্ধনের সে দিকে পদক্ষেপ করিবার যো নাই। তাই ধনীর অধিকারে পথের ভিখারী যদি বসিতে যায়, তাহা হইলে ধনী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহেন। একটা গল্প মনে হইতেছে। একজন পথিক সন্ন্যাসী দেশ পর্য্যটন করিতে ২ উপবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বনের চারিদিক্ ঘুরিয়া তিনি আশ্রয় স্থল খুঁজিতে লাগিলেন, খুঁজিতে ২ এক প্রকাণ্ড মনোহর অট্টালিকা তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই অট্টালিকাটি একজন নবাবের বিলাসমন্দির। অট্টালিকার দ্বার দেশে গিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে এক সুসজ্জিত রত্নখচিত সিংহাসন রহিয়াছে। সিংহাসন শূন্য, কেহই তাহাতে বসিয়া নাই। সিংহাসনের চারিদিকে বসিয়া পারিষদ্‌বর্গ যেন কাহার অপেক্ষা

করিতেছে। সন্ন্যাসী আর কাল বিলম্ব করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবারে সবেগে গিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ পারিষদ্‌গণ অবাক্! এমন সময় নবাব আসিয়া পৌঁছিলেন। নবাব ফকীরের কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, এ আসন আপনার বসিবার জন্য নয়। ইহা রাজ সিংহাসন, আমারই জন্য। ফকীর বলিলেন ইহা তোমার আসন কে বলিল ? এ স্থান পান্থশালা, এ আসন পথিকের বিশ্রাম করিবার জন্য। ইহা যে তোমারই আসন এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? রাজা বলিলেন আমার পিতৃ পিতামহ গণ এ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন, আমিও বাল্যকাল হইতে ইহা অধিকার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ইহা আমার বৈাক। ফকির বলিলেন, সেই জন্যই তো বলিতেছি, এ আসন পথিকের। তোমার পিতৃ পিতামহ গণ এ আসন কয়েক বৎসর অধিকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তুমিও না হয় আরও বিশ বৎসর ইহা অধিকার করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। আমিও সেই রূপ ইহা

দুচার ঘণ্টা অধিকার করিয়া চলিয়া যাইব। দুদশ বৎসর অধিকারের জন্য ইহা এত দিন " তোমার " হইতে পারে, আর দুচার ঘণ্টা অধিকারের নিমিত্ত ইহা এতক্ষণের জন্য " আমার " হইবে না কেন? তুমিও পথিক, আমিও পথিক। নবাব নিরুত্তর। ফকীর আরও বলিলেন, তোমার পিতৃ পিতামহ গণ উহাতে কিছু দিন কাটাইয়াছেন, তুমিও না হয় কিছু দিন কাটাইবে, আমিও সেই রূপ না হয় কিছু ক্ষণ কাটাইয়া লইলাম। তুমি, আমি চলিয়া গেলে আবার কেহ আসিয়া এ পান্থ-শালায় কিছু দিন কাটাইবে। সুতরাং ইহাকে তুমি এক বারেই "আমার" বলিয়া বুঝিয়াছ কেন? তাহাই প্রকৃত " আমার ", যাহাকে কখনও ছাড়িতে হইবে না, যাহার সহিত কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। তেমন বস্তুই অন্বেষণ করা উচিত। ফকিরের ভাষায় আমরাও তাহাই বলিতে চাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পথের পথিক আমরা এ নিদারুণ সংসার গহন কান্তারে আগন্তুক। আমাদের ঘর বাড়ি সমস্তই পান্থশালা। দুদশ

দিনের জন্য এ পান্থশালায় বিশ্রাম পূর্ব্বক স্বস্বকার্য্য সাধন করিয়া নিজ নিকেতনে যাইবার জন্য সম্বল বা সাধন লইতে হইবে। এ পান্থশালায় ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া চিরবিশ্রাম ভবনের পথে যাইতে হইবে। যে খানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, সেখানে গেলে "আমার" ও "আমি" মিলিয়া সমস্তই "আমিময়" হইয়া যায়, তাহাই আমাদের "নিজ নিকেতন"। সংসার আমাদের নিজ নিকেতন নহে। ইহা আমাদের প্রবাসক্ষেত্র। ভ্রান্তি বশতঃ সংসারের উপর আমিত্ব রূপ একটা আবরণ রচনা করিয়াছি। তাই "আমার সংসার আমার ঘর বাড়ি, আমার জিনিস পত্র" বলিয়া মনে করি। যাহা আমার জিনিস, তাহা আমার সহিত চির অবিচ্ছিন্ন থাকা চাই। সংসার যদি "আমার জিনিষ" হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের কখনও বিচ্ছেদ ঘটিত না। সংসারে আসিবার পূর্ব্বে সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, মরিয়া গেলেও বর্ত্তমান সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে

না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের জন্য যাহার সহিত সম্বন্ধ, তাহা কি আমার জিনিষ হইতে পারে ? যাহা আমার সহিত নিত্যনিয়ত বিদ্যমান, তাহাই আমার নিজস্ব। অবিদ্যাবশতঃই সংসারকে " আমার " বলিয়া মনে করিয়াছি, তাই তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট হয়। কেননা যাহা "আমার জিনিস" তাহার উপর আমাদের মায়া মমতা বসিয়া যায়। ছেলে পিলে ঘরকন্না স্ত্রী পরিবার সমস্তই " আমিত্ব মাখা " বলিয়াই আমাদের এত প্রিয়—এত রমণীয়। জগতের যে পদার্থ আমিত্বের অরুণ কিরণে প্রতিভাত তাহাই আমার লোভনীয়। যে পদার্থে আমিত্বের সম্বন্ধ যে পরিমাণে আছে, তাহা সেই পরিমাণেই আমার ঘনিষ্ঠ। আমিত্বের সম্বন্ধ না থাকিলে জগতে কেহই কাহাকে ভাল বাসিত না। যাহা আমিত্বমাখা যাহা নিজস্ব, তাহা তুচ্ছ হইলেও তাহাই তাহার পক্ষে প্রিয়। রাজার প্রকাণ্ড অট্টালিকা পড়িয়া গেলে তাঁহার যেমন দুঃখ হয়, নিঃসম্বল দীনের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির পড়িয়া গেলে

তাহার তেমনই মনোবেদনা উপস্থিত হয় । কেননা তাহার পক্ষে তাহা নিজস্ব। সম্রাট্ রাজত্ব হারাইয়া যেমন যাতনা অনুভব করেন, ভিক্ষুকের একটি ফুটো ঘটি হারাইয়া গেলে সেই রূপ দুঃখ তাহার উপস্থিত হয়। আজ মহা সমরক্ষেত্রে সৌম্যমূর্ত্তি বীরেন্দ্র কেশরীর মৃত্যু হইলে সে সংবাদে তোমার যে দুঃখ না হয়, তোমার একটি খাঁদা ছেলের কোন রূপ একটু অসুখ হইলে তাহা অপেক্ষা গভীর দুঃখ সাগরে ডুবিয়া যাও। কেননা তাহা তোমার " নিজ সামগ্রী "। বাল্য কাল হইতে ধীরে ২ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ২ শিক্ষা ও সঙ্গের গুণে এই আমিত্ব জ্ঞানের বিস্তার হয়। শিশু প্রথমে মা'কে " আমার " বলিয়া বুঝে, পরে পিতাকে, তৎ পরে প্রতিবেশীকে, কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে " নিজস্ব " বলিয়া বুঝে। তদনন্তর যৌবনে স্ত্রী পরিবার পুত্র পৌত্রাদিকে আপনার বলিয়া অনুরাগ করে। এই রূপ আমিত্ব জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। এই " আমিত্ব " আমাদের অস্থিতে ২ মজ্জায় ২ প্রতি স্নায়ু

শিরার অণু পরমাণুতে বিজড়িত। পার্ব্বতীয় লতা যেমন প্রস্তরের তলদেশ ভেদ করিয়া বদ্ধমূল হয়, সেই রূপ এই " আমিত্ব " বল্লরীর মূলদেশ আমাদের মনঃ প্রাণ আত্মার অন্তস্তল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ গাঢ়-সম্বন্ধ শিকড়কে আমরা উঠাইতে অসমর্থ। আমাদের ক্ষীণ শক্তি " আমিত্ব জ্ঞানের " নিকটে পরাভূত হইয়া তাহারই পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়। জানি " আমিত্ব " পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীব সুখী হয়, জানি "অহং মমেতি" জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইতে পারিলে পরমা নির্বৃতি লাভ হয়, কিন্তু আমার মত মায়ামমতাবিমোহিত আসক্তিপ্রাণ জীবের পক্ষে তাহা আকাশকুসুম। আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারি না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিস্তৃত করিয়া লইতে পারি। আমিত্বের ত্যাগে যেমন সুখ, আমিত্বের বিশ্ব বিশাল-বিস্তৃতিতে তেমনই সুখ। আমিত্বের ক্ষেত্রকে আমরা বর্দ্ধিত করিয়া লইব। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ না হইয়া আমিত্ব যেদিন বিশ্বপতির অনন্তসত্তায় বিলীন হইবে—জলে নিপতিত

বিন্দু মাত্রে তৈলের ন্যায় ভাবৎ পদার্থে ব্যাপিয়া থাকবে, সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জর পরিহার করিয়া আমিত্ব যেদিন পরম বিভুর চরণাকাশে উড্ডীয়মান হইবে, সেই দিনই আমিত্বের পূর্ণ পরিণতি। সেই দিনই তাহার চির সমাধি হইবে।৵

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা আমার নিজ সম্পত্তি তাহা বড় মধুর, বড় সুন্দর। তিল২ করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক তিলোত্তমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুরী যেমন বিরচিত হইয়াছে, সেই রূপ জগতের যাহা কিছু ললিত, যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু মনোমোহন, সে সমস্তের সার সর্ব্বস্ব সমষ্টিবদ্ধ হইয়া "আমার" জিনিষে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই "আমার" কথাটি শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট ভাবিতেও মিষ্ট। যাহা আমার, তাহাই যে আমার পক্ষে উত্তম, অর্থাৎ হিতকারী, অথবা যাহা উপকারী, তাহাই আমার প্রিয় কিনা, এ সমস্ত তত্ত্বকথা এখন বিচার করিবার অবসর আমার নাই। আমি যে এত ক্ষণ বলিয়া আসিলাম, তাহার

তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে চিরদিন "আমার" বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, তাহার কুহকে আমরা মজিয়া যাই, তাহার আসক্তিতে আমরা ডুবিয়া যাই। তাহার গুণাগুণের দিকে তাকাই না। তাহার শোভন অশোভনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করি না, প্রাণের একটানা স্রোত সেই কেন্দ্র স্থলের দিকে ধাবিত হয়। জগতের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক তুচ্ছ হউক, অন্তরের টান কিন্তু কি জানি কেন সেই দিকে তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। কলিকাতা হইতে কোন সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে তোমার হয়ত নিজগৃহ। কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে তুমি প্রবাস করিতেছ। কলিকাতা অতি সুন্দর সহর, অতি সমৃদ্ধি শালী নগরী। কলিকাতার চক্ষে তোমার জন্মভূমি পল্লীগ্রাম নিতান্ত কদর্য্য স্থান হইতে পারে, কিন্তু তোমার চক্ষে তোমার পল্লীগ্রাম স্বর্গ হইতেও গরীয়ান্। কেননা তোমার নিজের নিকেতন তথায় বিদ্যমান। তাই বিলাসের নন্দন কানন কলিকাতায় থাকিয়াও অবসর পাইলেই বাড়ি যাইবার বাসনা

তোমার প্রাণে জাগিয়া উঠে। কালকাতার সহস্র প্রলোভনময় পদার্থ রাশির উজ্জ্বল বিভা তোমার প্রাণের ভিতরে লীলা করিলেও সে সমস্তের উপর তোমার নিজ নিকেতনের গুপ্ত মাধুরী কি জানি কেন জাগিয়া উঠে। নিজসামগ্রীর এমনই মাহাত্ম্য এমনই কুহকিনী আকর্ষণী শক্তি আছে। তোমার নিজত্ব—তোমার আমিত্ব তোমার স্বদেশের সহিত কলিকাতা অপেক্ষা নাকি বহুদিন হইতে বহুপরিমাণে বিজড়িত, তাই তাহার প্রতি তোমার এত মায়া এত মমতা। তাই বাড়ির জন্য এত লালসা। বাহ্যশরীরী জীবের বাহ্যজগতের বাড়ির প্রতি যেমন আগ্রহ, সেই রূপ অন্তঃশরীরী অন্তরাত্মার নিজ নিকেতনে যাইবার আবেগ সূক্ষ্ম ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু ভ্রান্তি বশতঃ যাহাকে জীব নিজের বাড়ি বুঝিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ত পান্থশালা। আবার যাহা বাস্তবিকই নিজ ধাম, যাহাকে নিজের জিনিষ ভাবিয়া ভাল বাসা উচিত বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে

দিকে ত প্রাণ যাইতে চাহে না। মনঃ প্রাণ ত সে পথের পথিক হইতে চাহে না। সুতরাং এ বিভ্রাটের উপায় কি ?

শাস্ত্র বলিতেছেন ভগবানের নির্ম্মলধামই জীব! তোমার শান্তিময় নিজ নিকেতন। ভগবানই তোমার প্রকৃত আত্মীয়। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের এ কথায় মনঃ প্রাণ কিন্তু সায় দিতে শীঘ্র সাহস করে না। বিকৃতিময় চিত্তে কেবল সন্দেহের তরঙ্গই উঠিতে থাকে। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে সুখ লাভ হয়, এ কথায় আমার মলিন অন্তঃকরণ প্রতিধ্বনি করে কৈ ? বরং বিপরীত ভাবনার উদয় হইয়া থাকে। একটা গল্প বলিয়া সে বিপরীত ভাবনার সমর্থন করিতেছি। কোন একটি ভদ্রলোক পাগলদের আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য এক উন্মাদ-শালায় [পাগ্‌লা গারদে] গিয়া উপস্থিত হন। তিনি পাগলদের রীতি নীত চাল চলন দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটা পাগল তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আমার একটি গুহ্য প্রশ্ন আছে। অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিবেন কি ?

ভদ্রলোক। কি প্রশ্ন, বল।

পাগল। লোকে বলিয়া থাকে, নিদ্রায় সুখ লাভ হয়। আমি কিন্তু কথাটা বুঝিতে পারি না। আপনার মত কি ?

ভদ্রলোক। আমার আবার মত কি ? নিদ্রায় সুখ হয়, ইহা ত ঠিক কথা, তাহা তুমি বুঝিতে পার না, এই জন্যই'ত লোকে তোমায় পাগল বলে।

পাগল। আচ্ছা আমি নাহয় পাগল। আপনি ত পাগল নহেন, কথাটা আমায় বুঝাইয়া দিন দেখি, নিদ্রার কোন সময়ে সুখ হয়।

ভদ্রলোক। কেন, যখনই নিদ্রা আসে তখনই ত সুখবোধ হয়।

পাগল। কোন প্রিয় বস্তু পাইবার সময়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বস্তুটি সম্পূর্ণ রূপে না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ মনে একটা আকুলি বিকুলিই করিতে থাকে,

প্রিয় বস্তু পাইবার আশায় মনে উৎকণ্ঠাই হইতে থাকে, ইহা বোধ হয় আপনিও স্বীকার করিবেন। সুতরাং নিদ্রা যদি সুখের সামগ্রী হয়, তবে সেই প্রিয় বস্তুর সমাগম না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত ত ব্যাকুলই থাকে, অতএব তখন সুখ হয় কেমন করিয়া ?

ভদ্রলোক। আচ্ছা নিদ্রার আগমন সময়ে সুখ না হউক, নিদ্রা আসিয়া গেলে ত সুখ পাইতে পারি। নিদ্রার উপভোগ কালে ত সুখানুভব সম্ভব।

পাগল। তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে ? নিদ্রার সময়ে ত তুমি গাঢ় সুষুপ্তিতে অভিভূত থাক, তোমার মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই ত সে সময়ে অচেতন থাকে, সুতরাং তখন সুখানুভব হয় কেমন করিয়া ?

ভদ্রলোক। তবে বোধ হয় নিদ্রা ভঙ্গের সময় সুখ হয়।

পাগল। নিদ্রা যদি প্রিয় বস্তু হয়, তবে তাহার বিচ্ছেদে সুখ হইবে এ কেমন কথা ? প্রিয় বিচ্ছেদে দুঃখই হইয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর বিরহে সুখ হয়, ইহা ত

পাগলেই বলিতে পারে। এখন ভাবুন দেখি, আপনি পাগল, কি আমি পাগল।

ভদ্রলোকটি নিরুত্তর। তখন পাগল আবার বলিল, নিদ্রার কি আগমন সময়ে কি উপভোগ কালে কি ভঙ্গে কোন্ সময়ে যে সুখ লাভ হয় তাহাতো বুঝিলাম না। নিদ্রাতে সুখ হয় ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার তো এই মত। আমার এই মতের সহিত সাধারণ জগতের মত মিলেনা, তাই তাহারা আমাকে পাগল বলে। তেমনি আমার মতের সহিত তাহাদের মত মিলে না, সুতরাং আমিও তাহাদিগকে পাগল বলিতে পারি। জগতের সকলেই সব পাগল।

পাগলের মনে যেমন আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, আমাদের মত পাগলের মনেও সেই রূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন ঈশ্বর প্রাপ্তিতে সুখ লাভ হয়, কিন্তু কোন সময়ে সুখ হয় তাহাত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর রূপ পরম প্রিয় বস্তু সমাগমের সময়ে প্রিয়বস্তু পাইবার আশায় উৎকণ্ঠাময়ী এক রকম

ব্যাকুলতা চিত্তকে ঘিরিয়া ফেলে। সুতরাং সে সময়ে শান্তি কোথায় ? আবার ঈশ্বরকে যখন প্রাপ্ত হইলাম, তখন তাঁহার অনন্ত চিদেকরসসাগরে আমার আমিত্ব ডুবিয়া যায়। সে অকূল পাথারের তীব্র তরঙ্গে আমার আমিত্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারা হইয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। আমিত্ব তখন মরিয়া যায়। সুতরাং সে রস, সে শান্তি তখন উপভোগ করিবে কে ? পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, "যাহার সহিত" আমিত্বের সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই আমরা ভাল বাসি, তাহাই আমাদের পক্ষে প্রিয় পদার্থ। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আমিত্ব যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই পারেন, তখন আমিত্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিল কৈ ? সুতরাং ঈশ্বরকে "আমার জিনিস" ভাবিয়া ভাল বাসিতে পারি কৈ ? ভালবাসার রাজ্যে যে আমিত্ব প্রধান সম্বল, ঈশ্বরের জ্বলন্ত চিদগ্নিচ্ছটায় পুড়িয়া তাহা যখন ছারখার হইবে, তখন ঈশ্বরকে "আত্মীয়" বলিয়া ভাবিতে পারি কৈ ? সুতরাং, শাস্ত্র ত বলিলেন, জীব ! ঈশ্বরই তোমার

আত্মীয় তাঁহাকেই ভাল বাস; কিন্তু আমাদের অবোধ মন ত তাহা মানিতে চাহে না। আমরা মুখে বলি বটে তাঁহাকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ত কাযের কথা নহে। ভালবাসার গতি একদিকেই ছুটিয়া থাকে। আমাদের ভালবাসা যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হইত, তাহা হইলে পুনরায় তাহা সংসারের দিকে ধাবিত হয় কেন? আমাদের হৃদয়ের প্রেমসিংহাসনে সংসারকে বসাইয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং তিনি তথায় বসিবেন কেন? নর্দ্দমার কৃমিকীট যথায় কিলিবিল করে, রাজরাজেশ্বর তথায় কি বিরাজ করিতে পারেন? জগন্মাতার চির-সুন্দর মাধুরীচ্ছটায় মগ্ন হইয়া যদি তাঁহাকেই মনঃ-প্রাণে ভাল বাসিতে পারিতাম, তবে আর সংসারের স্ত্রীরূপের দিকে আসক্তির কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতাম কি? একটি প্রকৃত ঘটনা মনে হইতেছে। এক পরম সুন্দরী বেশ্যা নগরীর পথ পার্শ্বে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রূপের মাধুরী ছড়াইতেছে, এমন সময় একজন পথিক সাধু তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।

বেশ্যাটিকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াই সাধু কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেশ্যা ভাবিল বোধ হয় তাহারই কোন অপরাধে মর্ম্মাহত হইয়া সাধু কাঁদিতেছেন। বেশ্যা ভীত হইয়া করযোড়ে বলিল, প্রভো! আপনি কেন কাঁদিতেছেন আমি যদি কোন আপনার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি তবে মার্জ্জনা করুন। সাধু বলিলেন সুন্দরি! মা! তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই, আমি তাহার জন্য কাঁদিতেছি না। তোমার ঐ অপরূপ রূপ লাবণ্য লহরীর লীলা বিলাস দেখিয়া আমার মনে হইল যে সৌন্দর্য্যের আধার হইতে বিন্দুমাত্র ক্ষরিত হইয়া সংসারের এই সামান্য রূপ এত মধুর হইয়াছে, না জানি সে আধার কত মধুর কত সুন্দর। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরকে এজনমে দেখিতে পাইলাম না, তাই মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছি। যিনি প্রকৃত ভক্ত, যিনি তাঁহার ভালবাসায় পাগল, তাঁহার উহাই মর্ম্মকথা। আর আমাদের মত অধম সংসার

পাগলের যাহা মর্ম্মকথা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা আমিত্ব লইয়াই বিব্রত। যে জিনিষটিকে আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা লইয়াই আমরা সুখী হইতে চাই। আমাদের আমিত্ব সংসারের সহিত অধিক পরিমাণে জড়াইয়া গিয়াছে তাই তাঁহার রাজ্যে যাইতে ভীত হয়। সংসারের গহন কানন হইতে আমিত্ব বল্লরীর মূলোৎপাটন করিয়া ভগবানের প্রেমোদ্যানে তাহাকে রোপণ করিতে হইবে। সেই দেশের অমৃত সলিল যখন তাঁহার মূল দেশে সিক্ত হইবে, সেই দেশের বসন্ত বায়ু যখন তাহার বিশুষ্ক শাখা পল্লবের উপর দিয়া ধীরে২ প্রবাহিত হইবে, তখন সেই আমিত্ব-লতায় যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, তাহার সৌগন্ধে দিগন্ত আমোদিত হইয়া উঠিবে, ভুবন ভরিয়া যাইবে। যে ফল ধরিবে, তাহার সুরসে ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হইবে। স্বর্গলোক হইতে দেবগণ আসিয়া সে ফলের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া বিমোহিত হইবেন। সে ফল কেবল রস ভরা, তাহাতে এমন বীজ নাই যে আবার সংসারে

পতিত হইয়া পুনরাবৃত্তির সূচনা করিবে। এ ফলে সমস্ত ফলকামনাই নিঃশেষ হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমিত্ব হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি। কিন্তু এই আমিত্বেই যখন ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি হইবে, তখনই তাহা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে। ভেদবুদ্ধির গর্ভে ভালবাসার জন্ম, কিন্তু অভেদবুদ্ধির আগারে পূর্ণিমার চন্দ্রমার মত যে দিন ভালবাসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, সেই দিনই তাহার চরমোৎকর্ষ। দ্বৈতবুদ্ধি ভালবাসার ভিত্তি রচনা করেন, কিন্তু অদ্বৈত-বুদ্ধি যে দিন নিজক্রোড়ে তুলিয়া সেই ভালবাসার পার্থিব দেহে স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিয়া দিবেন, সেই দিন ভালবাসা মুক্তির সোপান হইয়া দাঁড়াইবে। ভালবাসা ও ভাল বাসার উপভোগ্য পদার্থ ও যিনি ভাল বাসেন এই ত্রিধারা মিলিয়া যে দিন এক ধারায় প্রবাহিত হইবে, তিনটি মিলিয়া যে দিন একটিতে মিশিবে, সেই দিনই ভালবাসার পূর্ণ পর্য্যবসান। সুতরাং অভেদই ভাল-বাসার লক্ষ্য। এই জন্য রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন,

শ্রীকৃষ্ণও রাধার সহিত অভিন্ন। রাধা আবার প্রেমের সহিত অভিন্ন, এই জন্য তিনি প্রেমময়ী। শ্রীকৃষ্ণও প্রেমের সহিত অভিন্ন, এই জন্য তিনি প্রেমময়। ক্ষীর ও ক্ষীরের পুতুল যেমন অভিন্ন পদার্থ, সেই রূপ প্রেম ও প্রেমের পুতুলী রাধাও একই পদার্থ। এই রূপ আমি, আমার জিনিস ও আমার জিনিষের প্রতি ভালবাসা এই ত্রিত্ব মিলিয়া যে দিন একত্বে পরিণত হইবে, সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে জীব যে দিন অবগাহন করিতে পারিবে, সেই দিনই তাহার আত্মা চরিতার্থ হইবে।

"আমার জিনিষ" বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ "আমিকে" স্বতন্ত্র রূপে বুঝা চাই। নিজ নিকেতন বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ "নিজ জিনিষটি প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যেমন একটি সাধারণ বিষয়ের উপর পাঁচ ভাইয়েরই অধিকার আছে। কিন্তু কে কোন্‌টুকুর মালিক, তাহা অগ্রে প্রমাণিত না হইলে প্রত্যেকের বিষয়ে স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে কেন। সুতরাং স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইলে অগ্রে মালিক ঠিক হওয়া চাই। আমার জিনিষটিও

সেই রূপ সাক্ষার বিষয়। এই সাক্ষার বিষয়ের কোন্ টুকুতে কোন্ "আমি" প্রকৃত মালিক, তাহার নির্ণয় হওয়া চাই। যখন কোন সুচারু বস্ত্র লইয়া শরীরকে আচ্ছাদন করিবার সময় বলি, "আমি কাপড় পরিতেছি" তখন শরীর "আমি"। কেননা শরীরে অহং বুদ্ধি হইয়াছে। যখন কোন রূপবতী যুবতীর রূপতরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় "আমি"। এই রূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিও আমি। যখন স্বপ্নে সুখানুভব করিতেছি, কিম্বা চিন্তার গভীর সাগরে ডুবিয়া আছি, তখন মনই "আমি"। যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া তন্নিবারণার্থ দৌড়িতেছি, তখন প্রাণ "আমি"। আবার যোগানন্দসুধা পান করিবার জন্য যখন ছুটিতেছি তখন আত্মাই আমি। সুতরাং বস্ত্রাদি হইতে যোগানন্দ পর্য্যন্ত সমস্তই "আমার জিনিষ" অর্থাৎ সাক্ষার বিষয়। আর শরীরাদি যেন পাঁচ ভাই তাহার অধিকারী। শরীর রূপ "আমির" যাহা বিষয়, তাহাতে ইন্দ্রিয় রূপ আমির

অধিকার নাই। এই রূপ "আমির" যাহা নিজস্ব, তাহাতে আত্মারূপ আমির দাবিদাওয়া নাই। সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার ভিন্ন ২ বিষয়ও ভিন্ন ২ মালিকও ভিন্ন ২। আজ কনিষ্ঠের বিষয়ে জ্যেষ্ঠ যদি হস্তক্ষেপ করিতে যান, তবে তাহা যেমন অনধিকারচর্চ্চা, সেই রূপ শরীরাদির উপভোগ্য বিষয়কে আত্মা যদি "আমার জিনিষ" বলিয়া কাড়িয়া লইতে যান, তাহা হইলে আইনানুসারে তিনি দণ্ডনীয়। সুতরাং আইনের সূক্ষ্ম কষ্টিপাথরে কষিয়া বুঝা গেল, প্রত্যেকের বিষয় স্বতন্ত্র। আমি রূপ অধিকারীও ভিন্ন। এত গুলি আমি রূপ কনিষ্ঠাদি ভাইয়ের মধ্যে যেই আমিই প্রকৃত জ্যেষ্ঠ, যে আমি প্রকৃতির জগতে আছে, অর্থাৎ যে আমি শরীরের পূর্ব্বে ছিলাম, বর্ত্তমানে আছি, ও ভবিষ্যতেও থাকিব। সেই আমিই শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ও বরিষ্ঠ, যে "আমির" পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, বিনাশ নাই ক্ষয় নাই, অটল অচলের ন্যায়, স্থির ধীর গম্ভীর সাগরের ন্যায় এ অনন্ত কাল-

বক্ষে যিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত "আমি"। যে আমি আমাদের অন্তর্জ্জগতে বাস করায় আমাদের মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয় তাঁহার আলোকে আলোকিত হইতেছে, যে "আমার" ব্যাপাকতাময়ী সত্তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে, সেই আমিই প্রকৃত আমি। অন্নময় প্রাণময়াদিকোষ হইতে সেই আমিকে বাছিয়া লইতে হইবে। চম্পক কুসুমের গন্ধ যখন পার্থিব বায়ু স্তর ভেদ করিয়া আমাদের ঘ্রাণপথে আবির্ভূত হয়, তখন সেই বায়ুস্তর গত কত প্রকার পরমাণু তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু সেই মিশ্রিত পরমাণু হইতে চম্পক গন্ধ যেমন স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ সংসারের পাঁচ মিশালি জিনিষ হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র রূপে বুঝিতে হইবে। ঐ আত্মার যাহা নিজস্ব তাহাই "আমার জিনিস"। সংসার আত্মার নিজস্ব নহে, কেননা শরীরাদিই তাহার মালিক, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং শরীর ইন্দ্রিয়াদির যাহা নিজ ধন, তাহার উপর তাহাদের ভাল বাসা বা আসক্তি

জন্মিতে পারে, কিন্তু আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আত্মা নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্ত আত্মার নিজ সামগ্রী কি? স্বস্বরূপই ইহার নিজ সামগ্রী। ইহা ছাড়া আত্মার আমার জিনিস বলিবার আর কিছু নাই। সুতরাং স্বস্বরূপই তাঁহার ভালবাসার ধন। দ্বৈত জগৎ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভালবাসা যখন এই স্বস্বরূপ গত হয়, প্রেম, প্রেমের জিনিস ও যিনি প্রেম করেন এই ত্রিবিধ ভেদ মিটিয়া গিয়া প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতা এই ত্রিত্ব বিনষ্ট হইয়া যখন সমস্তই আত্মরতিতে পর্য্যবসন্ন হয়, তখনই ভালবাসার চূড়ান্ত আদর্শ। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি অভিন্নতাই প্রেমের উদ্দেশ্য।

এত ক্ষণ ধরিয়া নিজ সামগ্রীটি কি, "আমি" পদার্থ কি, তাহার আলোচনা করিলাম। এখন নিকেতনের স্বরূপ কি লক্ষণ কি, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। যেখানে আমি ও আমার সমস্তই মিলিয়া আমিময় হইয়া যায়, সেই অদ্বৈতধামই জীবের নিজনিকেতন। যেমন অগ্নিপিণ্ড হইতে বিস্ফুলিঙ্গ রাশি চারিদিকে বিকীর্ণ

হয়, জ্যোতিঃসমষ্টিময় সূর্য্য হইতে কিরণ রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই রূপ সমষ্টিভূত পরমাত্মপিণ্ড হইতে এই ব্যষ্টি জীবাত্ম সমূহ নিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং যে কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়া কক্ষ ভ্রষ্ট লক্ষ২ নক্ষত্রের ন্যায় জীবাত্মা বিচরণ করিতেছে, সেই কেন্দ্রস্থলই জীবের সম্মিলন স্থল, সেই দেশেই তাহার নিজ নিকেতন। বহুদিন হইতে সে আবাসস্থানের পন্থা ভুলিয়া গিয়া আমরা অপথে কুপথে ঘুরিতেছি। আমরা বাড়ি হারাইয়া ফেলিয়াছি বটে, কিন্তু বাড়ির চিহ্ন যদি জানা থাকে, তাহা হইলে সেই চিহ্ন ধরিয়া পুনরায় বাড়ি পৌঁছিতে পারি। চিহ্ন জানা না থাকিলে হারান জিনিসের কিনারা করা কঠিন। তুমি গৃহস্থ, তোমার হয় ত এক খানি থালা চোরে লইয়া গিয়াছে। পুলিস হয় ত সেই বামাল শুদ্ধ চোরকে আদালতে হাজির করিল। বিচারক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জিনিসটি কি তোমার? সেই জিনিসটির কোন চিহ্ন যদি তোমার না জানা থাকে, তবে তুমি কেমন করিয়া

শপথ করিয়া বলিতে পার, সেই জিনিসটি তোমার। সুতরাং হারান জিনিসের চিহ্ন জানা চাই। ক্ষুদ্র একটি শিশু খেলা করিবার জন্য বাড়ির বাহির হইয়াছে। খেলা ধুলা সাঙ্গ করিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সহরের গলি ঘুঁজিতে পড়িয়া সে বাড়ির রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছে। মা'হারা বাড়িহারা শিশু রাস্তায় ২ কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাস্তার লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ির কিছু চিহ্ন মনে আছে কি ? তাহা হইলে তোমাকে বাড়ি লইয়া যাইতে পারি। অবোধ শিশুর অত কি মনে থাকিতে পারে ? সে কাঁদিয়া বলিল তাহার বাড়িতে দরজা আছে। আমরাও ঐ অবোধ বালকের ন্যায় অজ্ঞানভ্রান্ত জীব। সংসার নগরীতে খেলা করিতে আসিয়া বিষম গলি ঘুঁজিতে পড়িয়া বাড়ির রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছি। মাহারা শিশুর ন্যায় এ অকূল প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কেবল বাড়ির স্থূল চিহ্নটি আমাদের জানা আছে। সে চিহ্ন এই—

যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

"যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম"।

সংসারের গোলোক ধাঁধায় পড়িয়া পথভ্রান্ত জীব আমরা বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাই। আমাদের ক্রন্দন কোলাহল শুনিয়া পথের ধারে নানা প্রকৃতির ও নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া বলিতেছে আমাদের সহিত আইস তোমাদিগকে বাড়ি লইয়া যাইব। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ইঁহাদের নিজ বাড়িতেই আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান, তথায় গেলে আমরা শান্তি পাইব কেন? আমাদের নিজ বাড়িতেই আমরা যাইতে চাই। যেখানে আমাদের স্বজন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই ভগিনীগণ অবস্থিতি করিতেছেন তাহাই আমাদের নিজ বাড়ি। আমরা তাঁহারই চরণে শরণ চাই, যিনি আমাদিগকে নিজ বাড়িতে লইয়া যাইবেন। মহাত্মা গৌরাঙ্গদেব যখন অল্পবয়স্ক শিশু, তখন তিনি পথের ধারে এক দিন খেলা করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে বহুমূল্য অনেক অলঙ্কার দেখিয়া এক দুষ্ট তস্করের

শোভা লাগিল। তস্কর গৌরকে বলিল, আইস তোমায় কোলে করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দি। এই বলিয়া চোর গৌরকে কোলে করিয়া অলঙ্কার গুলি কাড়িয়া লইবার জন্য নিজের অভিমত স্থানে চলিল। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে, চোর নিজের বাড়িতে পৌঁছিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গদেবের বাড়িতেই উপস্থিত হইল। আজ তস্করের তীব্র প্রতিকূলতা ভেদ করিয়া যে শক্তি—গৌরাঙ্গদেবের যে জীবন মোহিনী দিব্যবিভূতি মহাপ্রভুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, আমরা সেই মহীয়সী শক্তির অভয় আশ্রয় অবলম্বন করিতে চাই। সে শক্তিকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমাদের ভিতরেই তাহা আছে। আমারা বাড়ির পথ চিনি না। তুমি বাহ্য কুহকিনী মায়া আমাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব ধন লুঠিয়া লইতে চায়। ঘোর অন্ধকারে জ্বলন্ত দীপের ন্যায় অবিদ্যার এ অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে যে শক্তি আমাদের নিগূঢ় মার্গের সূচনা করিয়া দিবেন, আমরা তাঁহার কথা না

শুনিয়া তাঁহার দিকে না তাকাইয়া আর কাহার কাছে ভরসা করিব। আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন করিবার জন্য সে অন্তঃশক্তি অবিরত যে ধ্বনি করিতেছেন, বাহিরের তুমুল কলরবে তাহা আমরা শুনিতে পাই না। আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয় গ্রাম যখন স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, বাহিরের সমস্ত আড়ম্বর যখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিবে, বাহিরের বৃত্তি সমূহ যখন অন্তর্ম্মুখীন হইতে পারিবে, তখনই ভিতরের কথা শুনিতে পাইব। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যখন মৃত হইয়া যাইব, তখনই সে অন্তর্দেবতার অন্তর্ধ্বনি শুনিতে পাইব। আমরা বাহিরের ব্যাপার লইয়া যখন নিতান্তই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, বাহিরের কোলাহলস্তূপে ডুবিয়া যখন আত্মহারা হইয়া যাই, তখন সে অন্তর্দেবতা বাহিরের দেবতা হইয়া—মহাপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্ত্র ভৈরব নিনাদে আমাদিগকে আহ্বান করেন। তাই যখন ন্যায়-শাস্ত্রের ব্যর্থ বাগ্‌বিতণ্ডারূপ বাহ্যনিনাদে বঙ্গদেশ বধির হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভক্তির অবতার গৌরাঙ্গদেব

অবতীর্ণ হইয়া বজ্রগম্ভীর নিনাদে জগৎকে ডাকিয়া বাহিরের শব্দস্তূপ ভেদ করিয়া ভিতরের কথা হরিধ্বনি শুনাইয়াছিলেন। তিনি ভিতরের কথা বাহিরে আনিয়া ভিতর বাহির এক করিয়া বাহ্য ব্যাপারলোলুপ সমাজকে অন্তর্দৃষ্টিশীল করিয়াছিলেন। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মহাপুরুষের আহ্বানে কর্ণপাত করে না। আমরা অবিশ্বাসী জীব, আমাদের হৃদয় অভিমানে ভরা। তবে কি আমাদের গতি নাই? তাহা কি কখনও হইতে পারে? দয়াময়ের রাজ্যে অগতিরও গতি আছে। অধিকারানুসারে শাস্ত্রে সকল মার্গই বিহিত হইয়াছে। গতিহীন নিম্নাধিকারীর পক্ষে তীর্থাটনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার এই তীর্থাদিরূপ সদাব্রতের ভিখারী নহেন যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া স্বাদু অন্ন পাক করিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য জ্ঞান যোগাদির পথ উন্মুক্ত আছে। আমরা জ্ঞান যোগ কর্ম, ভক্তি, এ সমস্তের কাহাকেও উপেক্ষা করি না। এ সমস্তের মধ্যে পরস্পর কিছু মাত্র বিরোধ নাই। সম্পূর্ণ

সদ্ভাব আছে। পার্থিব জগতে যাহাকে বাড়ি বলিয়া বুঝি, তথায় আমাদের ভাই ভগিনীগণ, যেমন নাচিয়া কুঁদিয়া খেলিয়া বেড়ায়, সেই রূপ জ্ঞান যোগ ভক্তি আদি ভাই ভগিনীগণ যে গৃহে পরস্পার হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর প্রীতির হাঁসি হাঁসিয়া সে গৃহ আলো করিতেছে, তাহাই আমাদের নিজ নিকেতন। নিজ দেশের পরিচিত লোক ধ্রুবাদি যে গৃহ প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন তাহাই আমাদের "নিজ নিকেতন"। প্রাণের ভাই প্রহ্লাদ যেখানে প্রেমে বিভোর হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, বিশ্ববন্ধু দেবর্ষি নারদ যে গৃহে বাণা তন্ত্রীতে সুর ধরিয়া গান করিতেছেন, শুক সনক সনন্দ যেখানে হৃষ্ট হৃদয়ে বসিয়া আছেন, বশিষ্ঠ বাল্মিকী ব্যাসাদি যেখানে সে গৃহের গুপ্ত ভাণ্ডারের রত্নরাশি গভীর ধ্যানে মজিয়া দর্শন করিতেছেন সেই আমাদের নিজ নিকেতন। নিজ নিকেতনে যাইতে হইলে আমরা জগতের সুখা-

পেক্ষা করিব না। ভয়াকীর্ণ বাহ্য জগৎকে মনের কথা প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে বড় ভয় হয়। সুতরাং সেদিকে তাকাইব না। নিজ নিকেতনের যাত্রী মহাত্মা রামপ্রসাদ যাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আব্দার করিয়া বলিয়াছিলেন—

মা! আমার খেলেনা হ'ল,

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, আমায় নিয়ে ঘরে চল।

সেই জগন্মাতার করুণা কটাক্ষের দিকে তাকাইয়া আসুন বলি মা! জীবনের সন্ধ্যা সম্মুখে উপস্থিত। দিন ফুরাইয়া আসিল। নিদারুণ কাল নিশি বিষম বিষধরীর ন্যায় গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। মা এ অধম দীন সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও। এই পথহারা অবোধ ছেলেকে হাতে ধরিয়া নিজনিকেতনে লইয়া চল। মা! তুমি মহিষমর্দ্দিনী হইয়া মহিষাসুরের উদ্ধার করিয়াছ, মা এত দয়া তোমার! পশু ও অসুরও তাহার অধিকারী হইয়াছে। দুঃখী দীন আমরা, মা দুঃখহারিণি! একবার অনাথ দেখিয়া নিরাশ্রয় দেখিয়া মা

হইয়া কাছে এসো ! একবার অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া দয়া করিয়া পথ দেখাইয়া তোমার—আমার নিজ নিকেতনে লইয়া চল। ধ্রুব প্রহ্লাদাদি তোমার সন্তানগণ জগতে ভক্ত হইয়া লীলা করিতে আসিয়া ছিলেন, আর আমাদের মত অভক্ত সন্তানগণ কুপথগামী হইয়া বড় যাতনা পাইতেছে মা ! মা লীলাময়ি ! সকলই তোমার লীলা, তোমার ও অনন্ত লীলা তুমিই বুঝ, আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। মা ! আর বুঝিতে চাহিনা আর খেলা করিতে চাহি না ; মা লইয়া চল, ঘরে গিয়া তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি, চির সুখে যোগনিদ্রায় মা যোগেশ্বরি ! বিশ্রাম করি।

আঁধারের মাণিক।

প্রকৃতির গুহ্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য মনুষ্য-জগৎ অবিরত ব্যস্ত। প্রকৃতির অনন্ত গর্ভের—অসীম ভাণ্ডারের প্রতি স্তর প্রতি পট উন্মোচন করিবার জন্য মানবজাতি সর্ব্বদা চেষ্টা পরায়ণ। প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে অধিকার করিবার জন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-রাজি সম্পূর্ণ রূপে আত্মসাৎ করিবার জন্য মনুষ্য জীবনে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সম্পূর্ণ তত্ত্ব কথা তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি প্রকৃতির উপাসক। যিনি প্রকৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি যাঁহার সহিত কথা কহেন, প্রকৃতির গভীর সাগরে যিনি নিমগ্ন—প্রকৃতির মরম মাঝারে যিনি ডুবিয়াছেন তিনিই প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন। প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহারই কাছে উদ্ভাসিত হয়, যাঁহার সহিত প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় জন্মিয়াছে।

প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটি পৃষ্ঠ আছে। সম্মুখ ও পশ্চাৎ বাম ও দক্ষিণ, আলো ও অন্ধকার এই দুইটি পৃষ্ঠ বিহীন কোন পদার্থই নাই। যিনি প্রকৃতির অপরিচিত, তিনি প্রকৃতির এই উভয় পৃষ্ঠ দেখিতে পাইবেন কিরূপে? প্রকৃতির বিরাট বিশাল কলেবরের পূর্ণ স্বরূপকে তিনিই জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইতে পারিয়াছেন প্রকৃতির গুহ্য কথা জানিবার জন্য যিনি প্রকৃতি রাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিত আর ফিরিবেন না, সুতরাং প্রকৃতির ঘরের কথা বলিবার লোক এ জগতে নাই। প্রকৃতির অনেক কথা শুনিবার অনেক বিষয় দেখিবার আছে। যাহা সম্মুখে দেখিতে পাই, ইহা প্রকৃতির পূর্ণ চিত্র নহে। ইহা প্রকৃতির একটি পৃষ্ঠ। প্রকৃতির অন্যপৃষ্ঠ শত সহস্র আবরণের মধ্যে অবগুণ্ঠিত। শত সহস্র ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে আভা ফুটিয়া বাহির হয়, আমরা তাহাই অনুভব করি। প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নিরাবরণ অনবগুণ্ঠিত

মূর্ত্তি আমরা কখনই উপভোগ করিতে পাই না। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র আবছায়া মাত্র। স্বরূপ তাহার বহুদূরে। স্বরূপ উপভোগ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। পৃথিবীর জীব প্রকৃতির স্বরূপ পরিপাক করিবার অধিকারী নহে। প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে গেলে পার্থিব চক্ষু ঝলসিয়া যায়, স্পর্শ করিতে গেলে ত্বক্‌শক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়, পঞ্চেন্দ্রিয় সে স্বরূপের কাছে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাই পার্থিব জীবের পক্ষে কেবল প্রকৃতির বিরূপেরই ব্যবস্থা।

সূর্য্য কিরণের স্বরূপ যাহা, তাহা কে জানে? কেই বা তাহার তাপ সহ্য করিতে পারে? আকাশ ও পৃথি-বীর কত লক্ষ ২ পর্দ্দা ভেদ করিয়া সূর্য্য রশ্মি এ জগতে আসিয়া পড়ে। অসংখ্য ব্যবধানের ভিতর দিয়া আসে বলিয়াই সূর্য্যতাপ আমাদের স্পর্শোপযোগী হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির স্বরূপ শত সহস্র ব্যবধান স্পর্শে শীতল হইয়া—বিরূপ হইয়া আমাদের কাছে আসে তাই

তাহা অনুভব করিতে পারি। যদি অব্যবধানে সূর্য্যের খাঁটি তেজ—শুদ্ধ স্বরূপ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে পৃথিবী তাহা ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। সৃষ্টি ছারখার হইত। সুতরাং প্রকৃতির শুদ্ধ মূর্ত্তি পৃথিবী সহ্য করিতে পারে না। প্রকৃতির বিরূপ লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গোমুখী হইতে পূতসলিলা ভাগীরথী নিঃসৃত হইয়াছেন। কত খালবিল কত নদনদীর সহিত মিলিত হইয়া কত বিকারগ্রস্ত হইয়া ভাগীরথী আমাদের সম্মুখে আসিয়াছেন। গোমুখীর বারিধারা যেমন নির্ম্মল পবিত্র, এই নদনদীর জলমিশ্রিত গঙ্গার জল তেমন পবিত্র তেমন নির্ম্মল নহে। অথচ এই গঙ্গার জলকেই ব্যবহার করিতে পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট আছি। বিশুদ্ধ খাঁটি গঙ্গার জল কৈ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে? সুতরাং প্রকৃতির স্বরূপের ধার দিয়াও আমরা যাইতে পারি না। বালক যেমন চাঁদ ধরিবার আশায় দৌড়িয়া যায়, সেই রূপ প্রকৃতিকে ধরিব বলিয়া আমরা দৌড়িয়া

যাই। আকাশের চাঁদ যেমন আকাশেই থাকিয়া যায়, সেই রূপ প্রকৃতিও চিরদিনই আমাদের অধিকার-পথের বাহিরে থাকিয়া যান। সুতরাং প্রকৃতিতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র তৃণ কণিকাও সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ✕

প্রকৃতির স্বরূপ তেজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, তাই শত ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির রশ্মিরেখা এ জগতে যাহা আসিয়া পড়ে, তাহাই পার্থিব জীবের পক্ষ যথেষ্ট। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা যে তেজে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, সে তেজ কি পৃথিবী ধারণ করিতে পারে? সে তীব্রতেজোময়ী প্রবাহ ধারা ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি প্রথমে মাথায় পাতিয়া লইয়া ছিলেন। তবে সে প্রশমিতবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং অনন্ত উৎস উৎসারিণী প্রকৃতির প্রস্রবণ ব্যবধানের ভিতর দিয়াই এ জগতে প্রবাহিত হইয়া পড়ে। ব্যবধানের ভিতর দিয়াই আমরা

প্রকৃতিকে দেখিতে পাই। অগ্নির যে তাপ স্পর্শ দ্বারা আমরা অনুভব করি, তাহা অগ্নির বিশুদ্ধ তৈজস মূর্ত্তি নহে। বায়ুর সম্পর্কে শীতল হইয়া অগ্নির তাপ আমাদের অনুভবের গোচরীভূত হয়। সুতরাং অগ্নির বিশুদ্ধ তৈজস মূর্ত্তি কি, তাহা আমাদের জানিবার যো নাই। অগ্নি তাপের ডিগ্রী আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু মাত্রা বুঝিবার সাধ্য নাই। এই রূপ জলের খাঁটি জলত্বও আমরা অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর খাঁটি পৃথিবীত্বও আমাদের উপভোগে আসে না। কেননা ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ইহারা সকলেই পঞ্চীকৃত। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে পরস্পর সংমিশ্রিত। সুতরাং খাঁটি জিনিষ উপভোগ করিবার অদৃষ্ট আমাদের নাই। প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহা ত আবছায়া—প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিম্বের স্বরূপ কি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারা যায়? নকল দেখিয়া আসলের প্রকৃতি

কি চেনা যায় ? ফটোগ্রাফে কাহারও হয় ত চমৎকার ধরণের ফটো উঠিল, কাহারও বা হাঁসিমাখা মুখখানির চিত্র উঠিল। কিন্তু তাহাই কি তাহার সার্ব্বদিক স্বরূপ ? আবার বিকৃত ফটোগ্রাফে যে প্রতিমূর্ত্তি উঠে, তাহাও বিকারগ্রস্ত হয়। সুতরাং প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি চিনিবার উপায় নাই। অবিদ্যার ফটোগ্রাফে প্রকৃতির এই যে জাগতিক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে ইহা অজ্ঞানবিকার-কলঙ্কিত, সুতরাং এ প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রকৃতির ছায়া লইয়াই আমরা বিমোহিত। প্রকৃতির কায়ার সংস্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।

প্রকৃতির বিচিত্র মূর্ত্তি। এই অনন্ত অপরিসীম মূর্ত্তিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে বৃত্তি দ্বারা কোন বস্তু তত্ত্ব বুঝিতে চাই, সেই বৃত্তি রূপ যন্ত্রটি পরিপুষ্ট না হইলে পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব স্থিরীকৃত

হইবে না। কিন্তু আমরা সে দিকে তাকাই না। আমাদের বৃত্তি রূপ যন্ত্রতন্ত্রের ভাল রূপ সম্বল না থাকিলেও বড় ২ সিদ্ধান্তে অগ্রে গিয়া হাত দিই। জলে কীটাণু আছে কিনা বুঝিতে হইলে যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োজন সেই রূপ প্রাকৃতিক তত্ত্ব যথার্থ রূপে বুঝিতে হইলে পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যে কথা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়, তাহার যেমন নড়ন চড়ন হয় না, ভুল ভ্রান্তি হয় না, সেই রূপ পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তি যাহা নির্ণয় করিবে, তাহাতে আর পরিবর্ত্তন হয় না, ভুল ভ্রান্তির লেশ মাত্র তাহাতে থাকে না। তাদৃশ পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তি না জন্মিলে, অপরিপুষ্ট পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃতিক তত্ত্বের উন্মেষ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তভিত্তি স্থাপন করা আর বালুকা স্তূপের উপর প্রকাণ্ড কারুকার্য্য খচিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা। এই যে আজকাল পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কত

মত প্রকাশিত হইতেছে সে সমস্তই এক রকম আন্দাজি। তাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিতে পারা যায় না। কেননা অদ্য যাহা স্থিরীকৃত হইবে, কল্য তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপে বর্ত্তমান বর্ষে যে মতের আধিপত্য চলিতেছে, আগামী বর্ষে হয়ত তাহা কোথায় উড়িয়া যাইবে। এই রূপ অনবরত পরিবর্ত্তন-শীল মত লইয়া মূর্খের চক্ষে ধাঁধা দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পদার্থতত্ত্ব কিছুই নিরূপিত হয় না। বুদ্ধির খেলায় লোককে গোলোক ধাঁদায় ফেলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সত্যের কিনারা কত দূর হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। লোককে এবং নিজের মনকে কোন রূপে বুঝাইতে পারিলেই যে সেই বুঝান জিনিষটা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, এমন নিশ্চিত কথা কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। আজি যে মত ঠিক বলিয়া প্রচারিত হইল, কল্যই যদি তাহা বেঠিক বলিয়া প্রতি-পন্ন হয়, তবে মানবের পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর

কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় ? পূর্ব্বে মত ছিল, চন্দ্র একটা গ্রহ পদার্থ এখন কিন্তু সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন উপগ্রহের মধ্যেই চন্দ্রকে ফেলা হইয়াছে। তখন মত ছিল, চন্দ্র আলোক বিশিষ্ট, এখন কিন্তু প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র নিজে আলোক শূন্য. তবে যে চন্দ্রের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। এখনকার এই মতই যে ঠিক, তাহা কে বলিল ? হয়ত এমতও দিন কতক বাদে উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং এমত যে ধ্রুব সত্য, তাহা কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন না। তবে উক্ত রূপ মতবাদীরা মূর্খ লোককে বুঝাইতে পারেন আমাদের এই মত যে বেঠিক, তাহা তুমি যখন প্রমাণিত করিতে পার না, সুতরাং ইহা ঠিক বৈ কি ? এই খানে গোপাল ভাঁড়ের সম্বন্ধে একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন সময় মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি নবাবের হুকুম আসল যে পৃথিবীর কোন খানটা ঠিক মধ্য স্থান, তাহা এক মাসের মধ্যে তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিত

মগুলী দ্বারা ঠিক করিয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণ চন্দ্র নবাবের এই খাম খেয়ালি অদ্ভুত হুকুম পাইয়া চিন্তিত হইলেন। বড় ২ পণ্ডিতকে উক্ত বিষয়ের একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবীর মধ্যস্থল ঠিক করিতে হইলে সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়াও মধ্যস্থল ঠিক করা বড় সোজা কথা নহে। আর এক মাসের ভিতরেই বা কেমন করিয়া সমগ্র পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসা যায়? পণ্ডিত গণ কিছুই কূল কিনারা করিতে পারিলেন না। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র বিষম চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজাকে চিন্তায় ম্রিয়মাণ দেখিয়া এক দিন গোপাল ভাঁড় ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সমস্ত কথাই বলিলেন। গোপাল ভাঁড় তাহা শুনিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার এত দুর্ভাবনা কেন? এ কথাটা এত দিন আমাকে খুলিয়া বলেন নাই কেন? আপনাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। আমি পৃথিবীর মধ্য স্থান ঠিক করিয়া দিব। রাজা

গোপাল ভাঁড়কে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গোপাল ভাঁড়কেই ঐ বিষয়ের ভার দিলেন। গোপাল ভাঁড় এক মাসের মধ্যেই পৃথিবী ঘুরিয়া মধ্যস্থান ঠিক করিবেন এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজার কাছ হইতে ছুটি লইয়া চলিয়া গেলেন। গোপাল ভাঁড় নিজ গ্রামের কিয়দ্দূরবর্ত্তী একটা জঙ্গলের ভিতরে একটা খুঁটা গাড়িয়া আসিলেন। বাড়ি আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এক মাস বাদে রাজার কাছে গিয়া সংবাদ দিলেন মধ্য স্থান ঠিক করা হইয়াছে। রাজা নবাবকে মধ্যস্থান দেখাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা ও নবাব পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে গোপাল ভাঁড়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিতে চলিলেন। গোপাল ভাঁড় সেই জঙ্গলের কাছে গিয়া বলিলেন, ঐ যে খুঁটাটি যে স্থানে পোঁতা রহিয়াছে উহাই পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এত দেশ থাকিতে তোমার এই বাড়ির কাছেই পৃথিবীর মধ্য স্থল হইল? ইহা কখনই সম্ভব নয়।

তোমার মত মিথ্যাবাদীকে আমি বিশেষ রূপে শাস্তি দিব। গোপাল ভাঁড় বলিলেন আজ্ঞে না। আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি লোক দ্বারা পৃথিবীর চারি ধার মাপিয়া দেখিতে পারেন উহা ঠিক মধ্য স্থান কিনা? নবাব বিষম বিপদে পড়িলেন। গোপাল ভাঁড়ের কথা মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইলে পৃথিবীর চারি ধার মাপিতে হয়। তাহা ত অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অগত্যা গোপাল ভাঁড়ের কথা তাঁহাকে মানিতে হইল। নবাব অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

আজ কালকার যাঁহারা প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ঐ রূপ গোপাল ভাঁড়ের মত জগৎকে চাতুরীর জালে জড়াইতে চাহেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, চন্দ্র এত হাজার যোজন বিস্তৃত। তুমি যদি আপত্তি কর ইহা কেমন করিয়া হইল, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয় চন্দ্র মণ্ডলটা মাপিয়া দেখিতে পার"। কাযেই

তাঁহাদের এই কথায় হার মানিতে হয়। চন্দ্রে আলোক আছে কিনা এ সম্বন্ধে আপত্তি করিলে তাঁহারা হয় ত বলিবেন, আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা যতক্ষণ না তুমি খণ্ডন করিয়া সেঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ ইহা তোমাকে ঠিক বলিয়া মানিতেই হইবে। তাঁহাদের এই ভীষণ আস্পর্দ্ধার তীব্র ভর্ৎসনায় ভীত হইয়া মূর্খ জগৎ তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাঁহাদের কথা ধ্রুব সত্য ভাবিয়া সেই পথের পথিক হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে অকাট্য, তাহাই যে স্থির সিদ্ধান্ত, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপরিপুষ্ট মনুষ্যচিন্তা চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল।

সুতরাং প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই দুরবগাহ ব্যাপার। প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু মীমাংসা হইয়াছে, সমস্তই অসম্পূর্ণ। আজ যে অন্ধকার ও আলোকের কথা বলিব ইহাও প্রাকৃতিক তত্ত্বের এক জটিল সমস্যা।

জগতের জীব অন্ধকারকে ভাল বাসে না। অন্ধকারের বীভৎস মূর্ত্তি সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আলোকের দিব্যজ্যোতি দেখিবার জন্যই প্রত্যেক জীব লালায়িত। সগর্ব্ব পদাঘাতে সকলেই অন্ধকারকে জগৎ হইতে বিদায় দিতে চায়। তাই দার্শনিক দর্শনাস্ত্রে অন্ধকারের অস্তিত্বের মূল পর্য্যন্ত উৎখাত করিতে চান। নব্য দার্শনিক বলিয়া থাকেন, অন্ধকার বলিয়া কোন একটা জিনিষ নাই। আলোক না থাকিলেই যখন অন্ধকারের উৎপত্তি, তখন আলোকের অভাব ছাড়া অন্ধকার আর কিছুই নহে। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া যদি একটা জিনিষ না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকার এই কথাটির সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া ? বিষয় না থাকিলে তাহার ভাষার উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া ? বাচ্য না থাকিলে বাচকের সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া ? আলোকের অভাবই অন্ধকার এ সিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে হইলে, অন্ধকারের পূর্ব্বে আলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অগ্রে আলোক বিদ্যমান থাকিলে তবে

তাহার অভাব অন্ধকার এই কথা সঙ্গত হয়। আলোক বলিয়া কোন জিনিষ যদি অগ্রে প্রসিদ্ধ না থাকে, তবে কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? সৃষ্টির প্রাক্‌-কালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, ইহা আর্য্যশাস্ত্র ও ইংরাজি শাস্ত্র বাইবেলেরও মত। বেদ বলিতেছেন—

তদানীং তম আসীৎ
তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্।

বাইবেলও বলিতেছেন—

"Darkness ruled the face of the universe and God said let there be light and there was light".

সুতরাং সে সময়ে আলোকের নাম গন্ধও জগতে ছিলনা। তেমন অবস্থায় আলোক বলিয়া যখন একটা জিনিস প্রসিদ্ধই নাই তখন কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? যে নিজে অসিদ্ধ, সে অপরকে সিদ্ধ করিতে পারেনা। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে আলোক যখন স্বয়ং অসিদ্ধ, তখন সে নিজের অভাব রূপে অন্ধকারকে সিদ্ধ করিবে কেমন করিয়া? অন্ধকারই জগতের স্বভাব,

আলোক বিকৃতি মাত্র। কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার রাজত্ব করিত, সৃষ্টির পরেও অন্ধকারই রাজত্ব করিবে কেবল এই পূর্ব্ব ও পর সময়ের সন্ধিস্থলে কিছু দিনের জন্য আলোকের লীলা খেলা। সুতরাং অন্ধকারই ব্যাপক পদার্থ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা অনাদি কাল হইতে স্থিত, এবং সৃষ্টির পরে যাহা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সেই অনাদি অনন্ত পদার্থ অন্ধকার হইল কি না অসৎ আর যে আলোক সৃষ্টিকালের কিয়ৎক্ষণ স্থায়ী, সেই আদি অন্ত বিশিষ্ট ক্ষণবিধ্বংসী আলোক হইল কিনা প্রকৃত সৎ পদার্থ ইহা নিতান্তই অন্যায় কথা। অন্ধকারের গর্ভ হইতেই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে, অন্ধকারের কুক্ষিতেই জগৎ বিলীন হইবে, বর্ত্তমানেও জগৎ একবারে অন্ধকার বিবর্জ্জিত নহে। সুতরাং ভূত ভাবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপী অন্ধকারের তুলনায় আলোক নিতান্তই ক্ষুদ্র পদার্থ। অন্ধকারের বিরাট বিশাল বিশ্বব্যাপী কলেবরের সম্মুখে আলোকের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং এত বড় অন্ধকার কিছুই

নয় বলিয়া ভুয়া জিনিষ বলিয়া উপেক্ষার জিনিষ নহে।

এখন অন্ধকার-তত্ত্ব একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। অন্ধকার জিনিষটি কি তাহা বুঝা বড় শক্ত। অন্ধকার শব্দের কেহ২ ব্যুৎপত্তিগত এই রূপ অর্থ করেন "অন্ধং করোতীতি অন্ধকারঃ" অর্থাৎ যাহা জীবকে অন্ধ করে, তাহাই অন্ধকার। যাহাতে দৃষ্টিশক্তির প্রতি-রোধ করে, তাহাই অন্ধকার। ইহাই যদি অন্ধকার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, তাহা হইলে আলোকও অন্ধকার হইয়া দাঁড়ায়। খানিক ক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও অন্ধের মত হইয়া যান। তিনি তখন চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পান না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারের অর্থানুসারে সূর্য্যা-লোককেও অন্ধকারের ভিতর ফেলিতে হয়। আবার তোমার পক্ষে যাহা অন্ধকার, অপরের পক্ষে হয় ত তাহা আলোক। তুমি মানুষ, অন্ধকারে তুমি কিছুই দেখিতে পাওনা কিন্তু এই জন্য তুমি অন্ধকারকে দৃষ্টি-শক্তির—প্রকাশ শক্তির বাধক বলিয়া স্থির করিয়াছ

কেন ? তুমি যে অন্ধকারে অন্ধ হইয়া থাক, বাদুরের পক্ষে সেই অন্ধকারই উজ্জ্বল আলোক। তোমার পক্ষে যে অন্ধকার একটা বিকট পদার্থ, বাদুরের চক্ষে তাহাই কিন্তু পরম সুন্দর। আবার যে দিবালোকে তুমি দেখিতে পাও, সেই দিবালোকই বাদুরের পক্ষে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং অন্ধকার যে নিতান্তই একটা জঘন্য পদার্থ, তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। অন্ধকারের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ স্থির করা বড়ই কঠিন। তুমি যাহাতে কিছুই দেখিতে পাওনা, তোমাকে যাহা অন্ধ করে,তাহাই যদি অন্ধকার হয়,তাহা হইলে অনেক প্রকারের আলোককেই অন্ধকারের দলে মিশাইয়া ফেলিতে হয়। যাহারা কেরচিন তৈলের দীপালোক সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা সরিসার তৈলের দীপালোকে প্রায়ই কিছুই দেখিতে পায় না। সুতরাং সরিসার তৈলের দীপালোক তাহার পক্ষে অন্ধকার। যাহারা short sighted, একটু দূরের পদার্থ যাহারা কিছুই দেখিতে পায় না, দূরত্ব তাহাদের

পক্ষে অন্ধকার। সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে অন্ধকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া উঠে। তুমি যে রাত্রির অন্ধকারকেই অন্ধকার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। যুক্তির অস্ত্রে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাই, তোমার ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া অন্ধকার জগদ্ব্যাপক মূর্ত্তিতে ভাসমান। যাহা যাহার যে ইন্দ্রিয়ের আবরণ কারক, তাহাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ইহাই যদি অন্ধকারের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই জগতের সর্ব্বত্রই অন্ধকার। অন্ধকারের এই সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে জগৎকে অন্ধকাররাশিপরিপূরিত বলিয়া বোধ হয় না। জগতে যেন অন্ধকার বই আর কথা নাই। অন্ধকারের গভীর গর্ভে জগৎ যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। চক্ষুর পক্ষে যেমন অন্ধকার, অন্যান্য বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের পক্ষেও সেই রূপ অন্ধকার জগৎকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজ কৃষকের পক্ষে দর্শন শাস্ত্র যেমন অন্ধকার, সেই রূপ দার্শনিকের পক্ষেও কৃষিবিদ্যা অন্ধকার। কবিরাজের

পক্ষে জ্যোতির্বিদ্যা যেমন অন্ধকার, জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কবিরাজি বিদ্যা সেই রূপ সমান অন্ধকার। সুতরাং অন্ধকার নাই কোথায়? অন্ধকারের প্রখর তরঙ্গ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। অসীম গগন তল বহিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিয়া অন্ধকার যেন অনন্তধারায় ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারের নিবিড় কালিমাস্তূপে জগৎ যেন ধ্যানময় যোগীর ন্যায় নিঝুম ভাবে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারসমুদ্রের বিরাট বক্ষে জগৎ যেন বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জীব জগৎ অবিরত ব্যস্ত। এই ভীষণ কালবিভাবরী রূপ বিষধরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। কিন্তু এ মজ্জাগত অস্থিমজ্জাগত অন্ধকারের কিছুই কূলকিনারা হইয়া উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতি অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে চায়। অন্ধকারের কুৎসিত

মূর্ত্তি পরিহার করিয়া আলোকের জ্বলন্ত ছটা আলিঙ্গন করিতে চায়। কিন্তু অগ্নির আলোক ছাড়া অন্ধকার বিদূরিত করিবার আর কি কোন উপায় নাই? অন্ধকার পরিত্যাগ করিবার জন্য অগ্নিময় আলোকের ব্যবস্থা কেন? অগ্নিময়ী দীপশিখায় গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সন্তাপ আরও বাড়িয়া উঠে, অগ্নির উগ্রতেজে প্রাণ মন যে বিকল হইয়া উঠে। অশান্তি অন্ধকারে পীড়িত হইয়া শান্তির ভিখারি হইয়া যাহার চরণে শরণ লইলাম, তাহাতে যদি অশান্তির তীব্র তাপ আরও বাড়িয়া উঠে তবে তাহা লইয়া কি করিব? পতঙ্গ অগ্ন্যালোকে উৎফুল্ল হইয়া তাহাতে যেমন ঝাঁপ দিয়া পড়ে, সেই রূপ উনবিংশ শতাব্দী আলোকে লম্ফ দিয়া পড়িতে চায় কেন? পুড়িয়া মরিবার জন্য নাকি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের বিকট মূর্ত্তি সকলেই ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতে চায়, আলোকের শুভ্র সুন্দর মনোমোহন ছবি দেখিবার জন্য জগতের

জীব লালায়িত। অন্ধকারের রাজত্বে কেহই বাস করিতে চায় না, সকলেই আলোকের সাম্রাজ্যের ভিখারি। অন্ধকারের জীর্ণ কঙ্কালময় আস্তরণ উঠাইয়া দিয়া আলোকের স্বর্ণ সিংহাসন তলায় সকলেই বিছাইতে চায়। অন্ধকার যেন মরণের কোষাগার, আলোক যেন জীবনের অমৃতভাণ্ডার, অন্ধকার যেন শবরাশির শ্মশান শয্যা, আলোক যেন প্রাণনশক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ। অন্ধকার যেন ভূত প্রেত পিশাচের লীলাস্থল, আলোক যেন সাধু মহাত্মা দেবতার বিরামক্ষেত্র। অন্ধকার যেন গাঢ় ঘন গভীর অরণ্যানী, আলোক যেন অমরাবতীর পারিজাত সহস্র সমাকীর্ণ নন্দন কানন। অন্ধকার ও আলোকের এই রূপই চিত্র জগতে অঙ্কিত হইয়াছে। পূতিগন্ধ পরিপূরিত কৃমি-কীটের কিলিবিলিময় সহস্র রৌরব নরকের সার সর্বস্ব অন্ধকারে আরোপিত হইয়াছে, আর স্বর্গের পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যের অনন্তধারায় আলোককে বিভূষিত করা হইয়াছে। বীভৎস রসের বোঝা মাথায় লইয়া

অন্ধকার জগতের কাছে নিন্দিত—ঘৃণিত—পদদলিত হইয়া মরণের অভিশাপবাণী ঘোষণা করিতেছে। অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া সহানুভূতির একবিন্দু অশ্রুজল নিক্ষেপ করিবার লোক এজগতে কেহ আছে কিনা জানি না, আমরা কিন্তু অন্ধকারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। অন্ধকার আলোক অপেক্ষা এতই তুচ্ছ এতই জঘন্য ইহা মনে করিতে পারি না। একটু বিচার করিলে দেখিতে পাই অন্ধকারই এক প্রকার আলোকের জন্মদাতা। অন্ধকারের ক্রোড়ে যে দিব্যালোক শক্তির বিকাশ হয় তাহাতে অন্ধকারকে সকলের বরণীয় বলিয়াই মনে হয়। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন, রাত্রির ঘোর অন্ধকারে খানিক ক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুর সম্মুখে দপ্ ২ করিয়া এক রকম কস্‌ফরস্ জ্বলিতে থাকে। এই তৈজস আলোক শক্তির জন্মদাতা অন্ধকার বই আর ত কেহই নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারই প্রথমে বিদ্যমান, তাহারই কুক্ষিভেদ করিয়া আলোক নিঃসৃত হইয়াছে,

সুতরাং অন্ধকার জননী স্বরূপ, আলোক তাহার ক্রোড়ে লালিত পালিত শিশু। অন্ধকারের মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না, তাই তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাঁহারা এই অন্ধকারের মর্ম্ম বুঝিতেন সেই আর্য্য ঋষি অন্ধকারকে সাধনা রাজ্যের প্রধান সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারে শবসাধনাদির প্রক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারের সূক্ষ্মশক্তি অবলম্বন করিয়া পিতৃগণ শ্রাদ্ধ প্রত্যাশায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহাও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। যথা বায়ুপুরাণে—

অমাবাস্যাদিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণা নৃণাম্।

সুতরাং যে অন্ধকার সাধনা-শক্তি-বিস্ফুরণের প্রধানতম সহায়, দৈবালোকশক্তির যাহা আধার, তাহাকে আমরা ঘৃণা করি কেমন করিয়া? যোগী যখন চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হয়েন, তখন তাঁহার

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সেই অন্ধকারস্তূপের মধ্যেই তিনি পরম জ্যোতিঃ দেখিতে পান। গভীর গিরিগুহান্ধকারেই আর্য্য ঋষিগণ তমোপহারী অপূর্ব্ব চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নাচ্ছটায় এক দিন অবগাহন করিয়াছিলেন। সুতরাং যে অন্ধকার সাধনা শক্তির উন্মেষক—পবিত্র দৈবশক্তির প্রস্রবণ, তাহাকে নিতান্তই জঘন্যতার চিত্রে চিত্রিত করা উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে বুঝিতে হয়, অন্ধকার বিশ্বব্যাপী। ভিতরে বাহিরে ওত প্রোত ভাবে অন্ধকার বিদ্যমান। এই বিরাট অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে হইলে বিরাট আলোক ধারার আয়োজন করিতে হইবে। এই বিশ্বব্যাপী অগ্নির আলোকময়ী জ্বালামালায় অন্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাতে শরীর শীতল হওয়া দূরে থাকুক তীব্র তাপে আরও সন্তাপিত হইয়া উঠিবে যে। জ্ঞানাগ্নির জ্বলন্ত শিখায় অন্ধকার না হয় ঘুচিয়া যাউক কিন্তু মনঃপ্রাণ যদি তাহাতে গরম হইয়া উঠে,

তাহার তীব্র তাপ চির বেদনাগ্রস্ত আত্মা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি আরও সন্তাপিত হইয়া উঠে তবে তেমন আলোক লইয়া আমাদের প্রয়োজন কি? যাহার স্নিগ্ধ অথচ সমুজ্জ্বল শান্ত অথচ দীপ্তিময় মাধুরীর ধারায় চিরদিনের আঁধার ঘুচিয়া গিয়া মনঃপ্রাণ সুশীতল হয়, ত্রিতাপতপ্ত আত্মা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যায় সেই **আঁধারের মাণিক** আমরা চাই। আমরা প্রখর সূর্য্যকিরণের ভিখারী নহি, যাঁহার অমল ধবল কিরণ-ছটায় হৃদয়গুহা ভাসিয়া অমৃতের বন্যা বহিয়া যায়, সেই অন্তর্গগন তলের মোহন পূর্ণ চন্দ্রমা যদি আসিয়া উদিত হন, তবেই ত আত্ম-চকোর তাঁহার প্রেমপীযূষ-পানে শান্ত হইয়া চিরদিনের জন্য কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। তবেই ত অশান্তির অগ্নিশিখা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইতে পারে।

এ গভীর অন্ধকার পূর্ণ জীবনে আঁধারের মাণিকই আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাতনাজার ধন মাণিককে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ধনেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এক

শ্রেণির সর্প আছে তাহার মাথায় মাণিক যখন প্রজ্বলিত হয়, যখন তাহার দিগন্তবিভাসী প্রভারাশি স্ফুরিত হয় তখন সেই প্রভার আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে সর্প পোকা মাকড় কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়, কিন্তু ইহাতে মাণিকের অপমান করা হয় । আর এক শ্রেণির সর্প আছে, তাহার মাথায় মাণিক যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন সেই মাণিকের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া নড়ন চড়ন বিহীন হইয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া আপনার রসে আপনি মজিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে । ইহারাই মাণিকের মূল্য বুঝে। যে মাণিকের জগদুজ্জ্বল উজ্জ্বল ছটায় নিমগ্ন হইয়া নিথর নিস্পন্দ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, যে মাণিক প্রাপ্ত হইলে আর কিছু পাইবার বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, আর কিছু কামনার বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই মাণিককে প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা আবার অন্য বস্তু পাইবার ইচ্ছা নিতান্তই নিন্দনীয় । যাঁহারা এক মাত্র লক্ষ্য মাণিককে প্রাপ্ত হইয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়া যান,

মাণিককে অন্যবস্তু পাইবার উপায় মনে করেন না, তাঁহারাই মাণিকের মর্ম্ম বুঝেন। যাঁহারা ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিকে নির্ব্বাণাদি সুখের উপায় মনে করিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের হাতেই মাণিকের অবমাননা—লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। প্রকৃত ভক্ত অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদের ন্যায় একমাত্র মাণিকের দিকেই নিশ্চল স্থিরতর দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্বপথে ধাবিত হইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রেমিক নির্ব্বাণ-সুখের আশা করেন না, জীবন্মুক্তির পিপাসা তাঁহার নাই, চতুর্ব্বর্গের কোন ফলেরই তিনি প্রার্থী নহেন তিনি কেবল তাঁহার চরণ দুখানির ভিখারি।

জহুরি ভিন্ন হীরকের মর্ম্ম অন্যে কি বুঝিতে পারে? বানরে কি মুক্তামালার মূল্য বুঝিতে পারে? বিষ্ঠার কীট কি পরমান্নের রস অনুভব করিতে পারে? নরকের কীট কি স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ লইতে পারে? সেই রূপ আনাড়ি—অভক্ত—অপ্রেমিক কি মাণিক চিনিতে পারে? তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

"সেজন প্রেমের ঘাট চিনেনা,
প্রেমে ডুবতে গিয়ে দুটি নয়ন থাকতে নয়ন মুদে হয় রে কানা।

কাঠুরেতে মাণিক পেলে দোকানেতে দেয় গো ফেলে,
কাল পাথর বলে।
অভিমানে মাণিক পড়ে রে বলে মহাজনে টের পেলে না।

সামান্য দোকানদারের হাতে যদি মাণিক পড়ে, তবে সে মাণিক চাউল ওজন করিবার বাটখারা হয়, কিন্তু মহাজনের হাতে পড়িলে তিনি তাহাকে গুপ্ত কোষে কত যত্নে কত আগ্রহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। নীরব নির্জ্জনে বসিয়া বিরলে সে গুপ্তনিধির মাধুরী ধারা পানে তিনি বিভোর হইয়া থাকেন। মণিবিশিষ্ট নিশ্চল ফণীর ন্যায় তিনি অগাধ ভাব-গম্ভীর হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় স্থিরধীর হইয়া যান। মাণিকের দিব্যদ্যুতি তরঙ্গে প্রাণ মন ভাসাইয়া তিনি আত্মহারা হইয়া যান, অঞ্চলের নিধি বুকের ধনকে বুকে রাখিয়া তিনিকৃতকৃতার্থ হইয়া যান।

ত্রিবলয়াকৃতি সর্পসদৃশ কুলকুণ্ডলিনীর মস্তকোপরি মাণিক (ব্রহ্মানন্দ) অবিরত সমুল্লসিত হইতেছে। ইহা সাত রাজার ধন। কেননা মূলাধারাদি ষট্‌চক্র ও সহস্রারপদ্মে আধিপত্য লাভ করিয়া ঐ মাণিককে

প্রাপ্ত হইতে হয়। সুতরাং সেত কঠোর সাধনার কথা। এ সাধের সাধ্য হইতে মাণিক আমরা লইতে পারিব না। কেননা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র পরামায়ু। দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যদি মাণিক স্বয়মেব আবির্ভূত হইয়া দেখা দেন তবেই ত আমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত আঁধারই ঘুচিয়া যাইতে পারে। আমাদের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণ কুটিরে লুকান রতন যদি জাগ্রত হইয়া উঠেন তবেই ত আমাদের আশা মিটিতে পারে, চির অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ চির উজিয়ারা হইতে পারে। আমরা তাঁদারের মাণিককে বুকে করিয়া রাখিতে চাই, তাঁহার দ্বারা আর অন্য কোন কার্য্য করিতে চাই না। হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে রাখিয়া আমরা জুড়াইতে চাই। প্রাণের সামগ্রীকে প্রেমের হার পরাইয়া প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া গোপনে অপূর্ব্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করিব। জগতের কেহ দেখিবে না জগতের কেহ শুনিবে না, নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে সে সুধার আস্বাদ লইব, ইহাই আমাদের বাসনা।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, অন্ধকার তুচ্ছ পদার্থ নহে, ঘৃণার জিনিষ নহে, অনেক সময় অন্ধকার সাধনার সম্বল। জীবের ঘোর অন্ধকারেই আঁধারের মাণিক দেখা দিয়া থাকেন। অন্ধকারই তাঁহার বিদ্যুদ্বিভা আকর্ষণ করিয়া আনে। আধিব্যাধিময় সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে জীব যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দিকে চায়। তখন সেই দুর্দ্দিন-অমানিশির সূক্ষ্ম শক্তি অবলম্বন করিয়া আঁধারের মাণিক অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কি জানি আঁধারের সহিত মাণিকের কি গুপ্ত সম্বন্ধ আঁধার হইলেই তিনি দৌঁড়িয়া আসেন। অন্ধকারের অভ্যন্তরেই তাঁহার বিমল জ্যোতি বিকশিত হয়। তাই যখন কংসের ভীষণ কারাগারে দেবকী ও বসুদেব ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়াছিলেন, সেই অন্ধকার স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া আঁধারের মাণিক উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সে মাণিককে প্রাপ্ত হইয়া দেবকী ও বসুদেবের জন্ম জন্মান্তরের আঁধার ঘুচিয়া গিয়াছিল। প্রহ্লাদ যখন পিতার আজ্ঞায় বিষপান

করিতে বসিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তখন বালগোপাল মূর্ত্তিতে আঁধারের মাণিক দেখা দিয়াছিলেন। সুতরাং যে অন্ধকার প্রভুর উজ্জ্বল সত্তাকে প্রস্ফুটিত করে, জগতের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, আমরা সেই অন্ধকারে ডুবিতে চাই। আসুন সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, প্রভো! অন্ধকারসাগরে আমাদিগকে নিমগ্ন করিয়া দাও! সেই গাঢ় ঘন গভীর অন্ধকারে আঁধারের মাণিক হইয়া তুমি দেখা দাও! তোমার শতবিদ্যুৎমাখান শতচন্দ্রনিংড়ানসুধামাখা মুখখানি লইয়া একবার দেখা দাও! নাথ! তোমাকে কেমন করিয়া ডাকিতে হয় জানি না। চন্দ্র সূর্য্যকে যেমন না ডাকিলেও তাহারা আসে, সেই রূপ আসিয়া হৃদয় কন্দর উদ্ভাসিত কর! এ দীন দুঃখীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভগ্ন মন্দিরে গুপ্ত নীলকান্ত মণি রূপে একবার উদিত হও। দুঃখী জীব চরিতার্থ হইয়া যাউক, তাহার চির দিনের আঁধার ঘুচিয়া যাউক।